## তৃতীয় অধ্যায়

# মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি : কাহিনিগত তুলনা

প্রথাগত ঐতিহ্যের বিশ্বস্ত অনুসরণ হল মঙ্গলকাব্যগুলি, কবির নিজস্ব কল্পনার দ্বারা তা সৃষ্ট নয়। ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় যে কাহিনি কবির কাছে এসেছে তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকে মান্য করে কাহিনি নির্মাণই ছিল মধ্যযুগোচিত প্রথা। আর এই প্রথাকে মান্যতা দিয়েই বিচিত্র কাহিনি ও কিছু খণ্ড বাস্তবচিত্রের সমন্বয়ে কবিকঙ্কণ রচনা করলেন তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যখানি। মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক ধারায় এই কাব্যখানি নিঃসন্দেহে এক অসামান্য সৃষ্টি। কিন্তু শুধুমাত্র গতানুগতিকতা নয় কাহিনিতে আধুনিকতার লক্ষণও সমানভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অষ্টাদশ শতকে আধুনিকতার যে সূচনা, ষোড়শ শতকে যেন তার স্ফূরণ ঘটতে দেখা যায়। একদিকে মঙ্গলকাব্যের নির্দিষ্ট প্যাটার্ন, প্রথাবদ্ধ বিভাজন, অন্যদিকে তার মধ্যেই গড়ে ওঠা কাহিনির অবয়বের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল সম্পর্কে অবশ্য খুব একটা প্রসন্ন মন্তব্য করেননি, কিন্তু এই সত্যটি তিনি প্রকারান্তরে স্বীকারও করেছেন। তাঁর মতে এ যেন—পৌরাণিক ও গ্রাম্যতার খিচুড়ি। শ্রোতাদের খাতিরে দেবতাদের শুধুমাত্র মানুষ নয় নিতান্ত পাড়া গেঁয়ে মানুষ রূপে অঙ্কন করতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এ কাহিনি একদিকে 'স্বপ্নবৎ' অন্যদিকে 'বাস্তব'। প্রকৃতপক্ষে এভাবেই মঙ্গলকাব্যের প্রথাবদ্ধতার মধ্যেও কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনি স্বকীয় হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে রামানন্দ যতি মুকুন্দের প্রায় দুই শতাব্দী পরের কবি। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' রামানন্দ পড়েছিলেন। ভারতচন্দ্র ও তাঁর পৃষ্ঠপোষক উভয়ের উল্লেখ তিনি করেছেন তাঁর রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যখানিতে। তবে রামানন্দ যতি সাধারণ পাঠকদের বা পাড়া গেঁয়ে মানুষদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তাঁর কাব্য রচনা করেননি। তাই তাঁর কাব্যে গ্রাম্যতা নয় আধ্যাত্মিকতা প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি প্রধানত ছিলেন একনিষ্ঠ সাধক। তাই দেব-দেবীদের মাহাত্ম্য যাতে কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ না হয় সেবিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন। তরল রসের আবেগে না ভেসে এবং এই মোহ থেকে জনচিত্তকে মুক্ত করার সঙ্কল্প নিয়েই

রামানন্দ তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনায় হাত দেন। প্রধানত দুটি কারণে রামানন্দ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যখানি লিখেছিলেন। যার একটি লোকহিতের আকাঙ্ক্ষা এবং অন্যটি বন্ধুজনের উপরোধ। রামানন্দের মনে হয় তিনি যদি এমন একটি জনপ্রিয় কাহিনিকে উৎকৃষ্টতর কাব্যের আধারে নতুন করে 'নীচরস' বর্জনের দ্বারা কথকতার আসরে পরিবেশন করতে পারেন, তাহলে তিনি লোকহিত করতে পারবেন—

১. ''এত দোষ উদ্ধারিতে লোকের চৈতন্য দিতে
চণ্ডীরচে রামানন্দ যতি।
অনেকের অনুরোধ কেহ না করিহ ক্রোধ
অনেক শিষ্টের অনুমতি।।''[১]

২. ''রামানন্দ যতি জগতে বিদিত।
লোকহিত হেতু করে ভাষা গীত।।''[২]

অগাধ পাণ্ডিত্য, উচ্চাঙ্গের রসানুভূতি ও লোকদর্শনের আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন রামানন্দ। সংস্কৃত ভাষায় তিনি প্রায় পঞ্চাশটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। যার উল্লেখ তিনি চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে করেছেন—

''যতি বলে পণ্ডিতেরা বুঝ দেখি সার।
সংস্কৃতে পঞ্চাশ পুস্তক করি আর।।''[৩]

তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিধি ছিল বৃহৎ। আর সেকারণেই 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে তিনি রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, ধর্মপুরাণ, কালীপুরাণ, কালিকাপুরাণ, স্কন্ধপুরাণ, পদ্মপুরাণ ইত্যাদি পুরাণ এবং কালিদাস, শঙ্করাচার্য, মনু, যোগিনীসাধক, আগম ইত্যাদি পণ্ডিত ব্যক্তিদের উল্লেখ করেছেন এবং প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে 'চণ্ডীমঙ্গলে'র কাহিনিতে তাঁদের রচিত বিভিন্ন শ্লোকের উল্লেখও করেছেন।

**কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী রচিত 'চণ্ডীমঙ্গলে'র কাহিনি**

মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক ধারাকে বজায় রেখে কবিকঙ্কণ তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যখানি রচনা করেছিলেন। গঠনের বিচারে কাব্যের মূল কাহিনি তিনটি। যথা—ক. শিব-পার্বতী

আখ্যান, খ. কালকেতু আখ্যান এবং গ. ধনপতি আখ্যান। অনেকে ধনপতি আখ্যানকে দু'ভাগে ভাগ করে থাকেন—১. ধনপতির পারিবারিক কাহিনি এবং ২. ধনপতি চণ্ডী বিবাদের কাহিনি। তবে প্রত্যেকটি কাহিনি একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল নয়, পূর্ণাঙ্গ এবং স্বতন্ত্র। মঙ্গলকাব্যের বিচারে 'চণ্ডীমঙ্গল'কে আবার চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—

**ক. বন্দনাংশ :** উপাস্য দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

**খ. গ্রন্থোৎপত্তির কারণ :** কবির আত্মপরিচয় জ্ঞাপক শ্লোক এবং কাব্য রচনার উদ্দেশ্য স্বরূপ দৈবাদেশ কিংবা স্বপ্নাদেশ।

**গ. দেবখণ্ড :** পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতার সমন্বয় স্থাপন।

**ঘ. নরখণ্ড :** শাপভ্রষ্ট দেবতার মর্ত্যে আগমন এবং ইষ্টদেবতার পূজা প্রচারের পর আবার স্বর্গে ফিরে যাওয়া।

'চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনিটি এইভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে—

**ক. বন্দনা :** গণেশ - বন্দনা, সরস্বতী - বন্দনা, মহাদেব - বন্দনা, লক্ষ্মী - বন্দনা, রাম - বন্দনা, চণ্ডী - বন্দনা।

**খ. গ্রন্থোৎপত্তির কারণ :** সঙ্কটে পড়ে কবির দামুন্যা ত্যাগ, পথের বিপদ, নিষ্করুন দারিদ্র্য ও বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় লাভ। পরিশেষে দেবীর স্বপ্নাদেশ ও কবিকে কাব্য রচনার আদেশ।

**গ. দেবখণ্ড :** সৃষ্টিপালা - অংশে আদি দেব-দেবী, জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কিত কাহিনি। শিব কাহিনি অংশে ভৃগু মুনির যজ্ঞ, গৌরীর দক্ষালয়ে গমন, গৌরীর নিবেদন, দক্ষের শিবনিন্দা, সতীর দেহত্যাগ, দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গ, গৌরীর জন্ম, গৌরীর অধিবাস, হর-গৌরীর বিবাহ, গৌরীর পূজা-পদ্মার উপদেশ, দেবীর আজ্ঞায় পুরী নির্মাণ, কলিঙ্গ রাজের স্বপ্নাদেশ, পশুদের প্রতি দেবীর বরদান, ইন্দ্রের শিব পূজার উদ্যোগ, নীলাম্বরের পুষ্পচয়ন, নীলাম্বরকে মহাদেবের অভিশাপ ইত্যাদি।

**ঘ. নরখণ্ড :** (i) কালকেতু কাহিনি - নিদয়ার গর্ভ, সাধভক্ষণ, কালকেতুর জন্ম - বিবাহ প্রসঙ্গ, কালকেতুর মৃগয়া, কালকেতুর ভোজন, চণ্ডীর নিকট পশুগণের দুঃখ নিবেদন, পশুগণকে ভগবতীর অভয় দান ও গোধিকারূপ ধারণ, গোধিকা রূপিনী দেবীর চিন্তা, ফুল্লরার খেদ, ফুল্লরা ও কালকেতুর কথোপকথন, ভগবতীর নিজ মূর্তি ধারণ, ফুল্লরার বারমাসের

দুঃখ, দেবীর শতনাম কথন, মহিষমর্দিনীর রূপধারণ, কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি, বনকর্ত্তন, গুজরাট নগর নির্মাণ, কালকেতুর নিকট ভাঁড়ু দত্তের আগমন, মুসলমানগণের আগমন, কলিঙ্গ রাজসভায় ভাঁড়ু দত্তের আবেদন, কালকেতুর যুদ্ধ যাত্রা, কলিঙ্গ নৃপতির সহিত কালকেতুর কথোপকথন, কালকেতুর কারাদণ্ড, কলিঙ্গরাজের প্রতি চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ, কলিঙ্গরাজ কর্তৃক কালকেতুর সম্মান, কালকেতুর প্রতি ভাঁড়ু দত্তের কপট বাক্য, ভাঁড়ু দত্তের মস্তক মুণ্ডন, কালকেতুর শাপান্ত, নীলাম্বরের জন্য ইন্দ্রের শোক, কালকেতুর প্রতি স্বপ্নাদেশ, নীলাম্বরের স্বর্গারোহন।

**(ii) বণিক খণ্ড :** রত্নমালার শাপপ্রাপ্তি, খুল্লনার জন্ম, পায়রা বাজি, খুল্লনার বিবাহ প্রস্তাব, ধনপতির গৌড়যাত্রা, খুল্লনার নির্যাতন, ছাগল চড়ানো, দেবীর অনুগ্রহ, ধনপতির প্রত্যাবর্তন, সংসার সুখ, খুল্লনার উৎসব, মালাধরের শাপপ্রাপ্তি, স্বজাতির ঘোঁট, খুল্লনার পরীক্ষা, ধনপতির সিংহল যাত্রা, পথের অভিজ্ঞতা, কমলে-কামিনী দৃশ্য, ধনপতির নিগ্রহ, শ্রীপতির জন্ম, শ্রীপতির বাল্যকথা, শ্রীপতির সিংহল যাত্রা, কমলে-কামিনী দৃশ্য, সিংহলে শ্রীপতির নিগ্রহ, শ্রীপতির পরিত্রাণে দেবীর উদ্যোগ, সিংহলের রাজার নতিস্বীকার, ধনপতির উদ্ধার, পিতাপুত্রের মিলন, সিংহল-ত্যাগ, দেশে প্রত্যাবর্তন, রাজসভায় সঙ্কট, দেবীর আনুকূল্য ও শ্রীপতির দ্বিতীয় বিবাহ, প্রথম পত্নীর দুঃখ, অষ্টমঙ্গলা, কলিকালের পাপাচার, খুল্লনার ও সস্ত্রীক শ্রীপতির শাপমোচন ইত্যাদি।

**ক. বন্দনাংশ :** মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের 'বন্দনা' অংশ হল এক দৈবীলীলার অতিপ্রকাশ। সুকুমার সেন বলেছেন—''বন্দনা অংশের সহিত কাব্য কাহিনির কোন যোগ নাই, আনুষ্ঠানিকভাবে গীত হইবার বেলায় দেবতা-বন্দনা প্রথমেই আবশ্যক, তাই এই অংশ 'স্থাপনা পালা'।''[৪] অর্থাৎ বন্দনাংশ হল পূজার পূর্বে আচমন বা আসনশুদ্ধির সমতুল্য। মঙ্গলকাব্য হল প্রকৃতপক্ষে আখ্যানমূলক লৌকিক পূজা। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের বন্দনা অংশে আখ্যানমূলক পূজার ভাবাত্মক দিকটি বা তাত্ত্বিক দিকটি পরিবেশিত হয়ে থাকে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ কাব্যের বন্দনাংশে দেবদেবীর স্তুতিতে পুরাণ ও তন্ত্রের ধারাকেই বহন করেছেন। তবে স্তোত্র রচনায় রীতিগত দিক থেকে অভিনবত্ব দেখানো সম্ভব না হলেও স্তোত্রগুলিতে দেশজ শব্দ ব্যবহারের দুঃসাহস দেখিয়েছেন। চণ্ডীমঙ্গলের শুরুতেই রয়েছে গণেশ বন্দনা। পূজার অগ্রভাগে গণেশের অধিষ্ঠান। শিবপুরাণ মতে দেবীর পক্ষ অবলম্বন

করে গণেশের সঙ্গে সম্মিলিত দেববাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল, বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রে গণেশের মাথা কাটা যায়। দেবীকে তুষ্ট করার জন্য দেবগণ গণেশের পুনর্জীবন দান করে কিন্তু আসল মুণ্ড না পাওয়ায় হস্তীর মুণ্ড দিয়ে শেষ রক্ষা হয়। সেসময় থেকেই শিবের বরে গণেশের সর্ব পূজার অগ্রে স্থান। দেবীপুরাণে গণেশ বিঘ্নাসুরকে বধ করে হয়েছেন 'সর্ববিঘ্নহর'। আটদিন ব্যাপি দেবীর পূজা যাতে নির্বিঘ্নে হয় তাই কবি বলেছেন—

''প্রণত-জনের নিঘ্ন দূর কর মোর বিঘ্ন
তব পদ করিল বন্দনা ...''[৫]

পুরাণে গণেশকে নিয়ে বহু আখ্যান প্রচলিত আছে। ফলে গণেশের নানা রূপের বৈচিত্র্যও দেখতে পাওয়া যায়—হরিদ্রা গণেশ, চৌর গণেশ, বিনায়ক ইত্যাদি।

মুকুন্দের বর্ণনায়—

''অঙ্গের বন্ধুক-ছটা অজানুলম্বিত জটা
শশিকলা মুকুটমণ্ডন
চরণ-পঙ্কজরাজে কনক নূপুর বাজে
অঙ্গদ বলয়া বিভূষণ।''[৬]

বন্ধুক হল বাঁধুলি বা বন্ধুজীব পুষ্প। এ ফুল দুপুরে ফোটে এবং এর বর্ণ রক্তাভ। সেজন্য এ ফুলের নামান্তর রক্ত। সংস্কৃতের সমাসবদ্ধতার জটাজাল থেকে কবি গণেশকে কিছুটা মুক্ত করেছেন। এখানেই তাঁর বন্দনায় মৌলিকতা। গণেশ গণদেবতা—তাই গণেশ বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে কবি আসলে শ্রোতৃমণ্ডলীরূপ গণদেবতার বন্দনা করেছেন। আর এই কবিসুলভ ব্যঞ্জনাতেই মুকুন্দের দক্ষতা। পরবর্তীকালে এসেছে চৈতন্যবন্দনা। দেবকল্প চৈতন্যদেব কবিচেতনায় সাক্ষাৎ ভগবান। মুকুন্দের চৈতন্যবন্দনা কর্মকৃতিত্ব বর্ণনার সংক্ষিপ্তসারে পর্যবসিত—

''প্রেমভক্তি-কল্পতরু অখিলতন্ত্রের গুরু
গুরু কৈল কেশব ভারতী।''[৭]

কিংবা,

''শ্রীকবিকঙ্কণ গায় বিকাইনু রাঙ্গা পায়
আজি মোর সফল জীবন ... ''[৮]

ইত্যাদি অংশগুলিতে বৈষ্ণব পদাবলীরই প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হয়েছে। চৈতন্য বন্দনায় মুকুন্দ প্রথানুগত হলেও মৌলিকতাতেও অনন্য।

সরস্বতী বন্দনাও পুরাণ ও তন্ত্রানুযায়ী—

"বিধিমুখে বেদবাণী বন্দো দেবী বীণাপাণি
ইন্দু কুন্দ তুষার-সঙ্কাশা
ত্রৈলোক্যতারিণী ত্রয়ী বিষ্ণুরূপা বর্ণময়ী
কবিমুখে অষ্টদশ ভাষা।"[৯]

সরস্বতীর প্রচলিত ধ্যানমন্ত্র ও স্তোত্রাবলী অনুধাবন করে কবি একান্তভাবেই নিজের মনে সরস্বতীর রূপ ও মহিমা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলেছিলেন। কবিকঙ্কণের সরস্বতী বন্দনা সরস্বতী - তন্ময়তার এক সামগ্রিক চেতনায় উদ্ভাসিত। মুকুন্দের লক্ষ্মীবন্দনা পাঁচালীতে পর্যবসিত—

"অজিত - বল্লভা দেবী ব্রহ্মার জননী
তোমার চরণ সেবি জোড় করি পাণি।"[১০]

**খ. গ্রন্থোৎপত্তির কারণ :** বাংলা মঙ্গলকাব্যের সকল শাখাতে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ উপস্থিত করা এক আবশ্যিক প্রথা। প্রকৃতপক্ষে দেবাদেশের উপাখ্যানকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার আগ্রহে সমস্ত কবি নিজ নিজ তৎকালীন পরিবেষ্টনকে যথাসাধ্য বস্তুগ্রাহ্য বাস্তব করে উপস্থাপনে ঐকান্তিক। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ সেই প্রথাবদ্ধ রীতিকে স্বীকার করেও তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাকে ইতিহাসে সমুদ্রিত করেছেন। এজন্যই কবির ইতিবৃত্তমূলক বিবরণীটি এত মূল্যবান। এর মধ্যেই তদানীন্তন যুগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট নিহিত আছে।

গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশটিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটি কবির বংশপরিচয় এবং দ্বিতীয়টি তাঁর গ্রন্থ রচনার ইতিবৃত্ত। এই দ্বিতীয় পর্বে গ্রন্থরচনার কারণ হিসাবে আত্মকাহিনিতে দেখা যায় যে দামিন্যায় প্রায় ছয়-সাত পুরুষ ধরে কবিদের বসবাস ছিল। তাঁদের পেশা ছিল কৃষিকাজ। হঠাৎ অধর্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে মামুদ সরিপ ডিহিদার নিযুক্ত হন। রায়জাদা উজির হয়ে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপর শুরু করেন বিশেষ নিপীড়ন। চতুর্দিকে দেখা দেয় অরাজকতা এবং মানুষও দিশেহারা—

‘‘উজির হইল রায়জাদা বেপারি বৈশ্যের খদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হইল ঐরি
মাপে কোনে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাঞি মানে প্রজার গোহারি।’’[১১]

মুকুন্দের শুভানুধ্যায়ী স্থানীয় শাসক রাজা গোপীনাথ নন্দী রাজবন্দী হলেন। কবি নিজেও রাজভয়ে ভীত হয়ে দামিন্যা ত্যাগের পরিকল্পনা নেন। সুহৃদ রামানাথ বা রামনন্দীর সঙ্গে সামান্য সম্বলটুকু নিয়ে কবি সপরিবারে সাতপুরুষের ভিটা ত্যাগ করেন। যাত্রাপথে প্রথমে তাঁরা এলেন ভালিয়া বা ভেলো গ্রামে। কিন্তু যাত্রাপথে দেখা দিল বিপর্যয়। দস্যু রূপ রায় কবির সমস্ত অর্থ অপহরণ করে। তবে ঐ গ্রামে যদু কুণ্ডু (তিলি) তাঁকে তিনদিনের মতো আশ্রয় ও আহারের ব্যবস্থা করার পরে কবি সপরিবারে গোড়াই বা মুড়াই (মুণ্ডেশ্বরী) নদী পার হয়ে আসেন ভেউটিয়া বা কেউটিয়া গ্রামে। সেখান থেকে দ্বারকেশ্বর নদী পার হয়ে আসেন পাতুলিপুরী বা পাতুলী গ্রামে। সেখানে গঙ্গাদাস কবিকে অনেক উপকার করেন। কবি এরপর গঙ্গাদাসের আশ্রয় ত্যাগ করে দামোদর নদী পার হয়ে গোচাড়িয়া বা কুচট্যা গ্রামের এক পুকুর পাড়ে আশ্রয় নেন। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর কবি রাজভয়ে ভীত এবং পরিশ্রমে ক্লান্ত অবসন্ন—

‘‘তৈল বিনে করি স্নান কেবল উদক পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে।
আশ্রয়ি পূখুর আড়া নৈবেদ্য শালুক-নাড়া
পূজা কৈল কুমুদ প্রসূনে
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা গেলে সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।’’[১২]

অগত্যা পুকুরের জল পান করেই ক্ষুধা নিবৃত্তির চেষ্টা। রুক্ষ মাথায় শরৎকালের এই দিনটিতে পুকুরের শালুক তুলে এবং কুমুদ পুষ্পে কবি দেবতার পূজা সাঙ্গ করেন। কবির তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দেবী চণ্ডী স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে কাব্য রচনার নির্দেশ দেন। স্বপ্নের কথা রামানন্দীকে জানিয়ে আবার তাদের পথ চলা। এবার তাঁরা শিলাই নদী পার হয়ে আড়রা নগরে প্রবেশ করেন। কবি আড়রার রাজা বাঁকুড়া রায়ের নিকট উপস্থিত হয়ে সবিশেষ

নিবেদন করেন। রাজা কবিকে আশ্রয় দিয়ে পুত্র রঘুনাথের শিক্ষক হিসাবে তাঁকে নিয়োগ করেন। দৈব নির্দেশের কথা রামানন্দী কবিকে বারবার স্মরণ করান এবং শেষে রাজা রঘুনাথের অনুরোধে রাজ আশ্রয়ে মুকুন্দ তাঁর কাব্য সমাপ্ত করেন। মুকুন্দের এই আত্মপরিচয় অংশটি নানা দিক থেকে গভীর তাৎপর্যবোধক। কারণ এর মধ্যে তৎকালীন দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিশ্বস্ত পরিচয় নিহিত আছে।

**গ. দেবখণ্ড :** মঙ্গলকাব্যের প্রথাকে মেনে মুকুন্দ চক্রবর্তী দেবখণ্ডের কাহিনি নির্মাণ করেছেন। হর-পার্বতীর বিবাহ পূর্ব এবং বিবাহোত্তর জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন কবি। দেবদেবীদের আচার-আচরণের মধ্যে দেখা দিয়েছে মর্ত্যজীবনের ছবি। কবি যেন এক গৃহকাতর মন নিয়ে এই চরিত্রগুলিকে অঙ্কন করেছেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রে দেবদেবী পরিকল্পনায় বাঙালি কবি উচ্চ আদর্শ স্থাপন করতে পারেননি। দেবতার মহিমা বা দেবত্ব অনেক সময় ধূলিমলিন রূপ নিয়েছে।

দেবখণ্ড আরম্ভ হয়েছে সৃষ্টি বর্ণনার মধ্যদিয়ে। ত্রিভুবন ও দেবাসুর নর সৃষ্টির পর দক্ষ কন্যা সতীর সঙ্গে শিবের বিবাহ এই কাহিনিগুলি অনেকাংশই কবি পুরাণ থেকে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে যোগ দিয়েছে কবির একান্ত বাঙালি জীবনের অনুভূতি। স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও সতী পিতার গৃহে রওনা হলেন। অগত্যা শিব অনুচরদের দেবীর সঙ্গে পাঠালেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় দক্ষের আচরণ। স্বভাবতই প্রসূতি কন্যাকে দেখে তিনি খুশি হলেন। এবং সব ভুলে গেলেন। তাঁর আশীর্বাদের মধ্যে পিতৃহৃদয়ের অনাবৃত প্রকাশ দেখা দিয়েছে—

‘‘আয়্যাতে জাউক কাল ঘুচুক দুর্গতি
চিরজীবী হৌক স্বামী সুস্থির সুমতি।’’[১৩]

কন্যাকে দেখে তিনি শিবের মঙ্গল কামনাই করেছেন। বাঙালি জীবনের কন্যাপ্রীতি এমনই। কন্যা বিনা নিমন্ত্রণে এলে রাগ হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু মানবজীবন সবসময় বাধাধরা ছকে চলতে অভ্যস্থ নয়। কবি তা জানেন। মমতায়, স্নেহে, প্রেমে মানুষের ভেদাভেদ, ঈর্ষা, ক্রোধ দূরীভূত হয়ে যায়। কবিকঙ্কণের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় দক্ষযজ্ঞকালে বীরভদ্রের উপস্থিতিতে। গোব্রাহ্মণ বধ মহাপাপ। বীরভদ্রের ভয়ে ভীত ব্রাহ্মণগণের আচরণ মুকুন্দ বর্ণনা করেছেন। গৌরীর জন্য হিমালয়ের ‘চিন্তিত অন্তর’কে কবি প্রকাশ করেছেন কয়েকটি ছত্রে। এই বর্ণনায় স্বর্গের ছায়া অনুপস্থিত। কুলীনকুলসর্বস্বতা তখন সমাজের অঙ্গ

ছিল। স্বর্গেরও তা থেকে মুক্তি নেই। কন্যা বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাপের চিন্তা বাড়ে। হিমালয় চান কুলে শীলে উঁচু জামাই। শিব অবশ্য শাশুড়ীর বেদনাটুকু মুছে দিয়েছিলেন 'মদনমোহন' রূপ ধারণ করে। এরপর শিব-উমার ঘরজামাই থাকা এবং সেই নিয়ে মায়ের সঙ্গে উমার কলহ ইত্যাদি ঘটনার মধ্যদিয়ে সমকালীন পারিবারিক জীবনের চিত্রকে চিত্রিত করেছেন কবি—

''মিথ্যা কাজে ফিরে পতি নাঞি চাষবাস
ভাত কাপড় কত না জোগাব বার মাস।
দুগ্ধ উত্তলিআ পড়ে নাঞি দেহ পানি
সখি সঙ্গে খেল পাশা দিবস রজনী।''[১৪]

উমাও যথারীতি মায়ের সঙ্গে কলহে নেমে পড়লেন। সাধারণ কন্যার মতোই তিনি স্বামীর নিন্দা শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠেন। এরপর সংসারের গুরুদায়িত্ব উমা-শঙ্কর নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। নিত্যদিনের অভাব-অনটন, স্বামীর উদাসীন্য, উমার খেদ — এই সব সমাজের পরিচিত জীবনের ছবি আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। নারীর জীবনের চরম অসহায়তার ছবি কবি মুকুন্দ এভাবেই ফোটাতে চেয়েছেন। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য পার্বতী পূজাপ্রচারে উৎসাহী হলেন। কালকেতুর জন্ম সূচিত হল। নীলাম্বর-মহাদেব প্রসঙ্গ বর্ণনায় কবি কৃতিত্বের পরিচয় লক্ষ করা যায়। দারুণ পিপীলিকার বিষে মহাদেবের যন্ত্রণার শেষ নেই। মহাদেব ক্রোধান্বিত হলেন—

''দারুণ পিপীলিকা তার প্রবেশে কুন্তলে
মরমে দংশিলা হর হইলা আকুলে।
অনল সমান পোড়ে পিপীলিকার বিষ
অভিমানে করে হর মন বিমরিষ।''[১৫]

মহাদেব কর্তৃক শাপগ্রস্ত হয়ে নীলাম্বর মহাদেবের কাছে করুণ প্রার্থনা জানিয়েছেন—

''কৃপা কর দেববর্গ  না যাই নরক স্বর্গ
তোমার চরণে রহে মন।
দেখিআ তাহার দুঃখ  লাজে শিব হেটমুখ
আজ্ঞা দিলা দেব পঞ্চানন

করহ চণ্ডীর ভক্তি তিনি তোরে দিবে মুক্তি
আসিবে আপন নিকেতন।''[১৬]

সেইসঙ্গে ছায়ার শোকোচ্ছ্বাসে চিত্রণে মুকুন্দ বৈধব্য যন্ত্রণার নিদারুন চিত্র অঙ্কন করেছেন।—

''আলুয়াইল কেশভার তেজে বালা অলঙ্কার
সঘনে নাড়য়ে আম্রডাল।
সুরপুরে কোলাহল সভার লোচনে জল
শচীর হৃদয়ে বাজে শাল।''[১৭]

সেইসঙ্গে কবি ছায়ার সতী হওয়ার চিত্রও বর্ণনা করেছেন। নীলাম্বর কালকেতু রূপে ধর্মকেতুর পুত্র হিসেবে জন্ম নিলেন আর তাঁর পত্নী ছায়া সঞ্জয়কেতুর ঘরে হীরাবতীর গর্ভে ফুল্লরা নামে আবির্ভূতা হলেন। দেবী চণ্ডী জরতী ব্রাহ্মণীর বেশে ধর্মকেতুর পত্নী নিদয়াকে পুত্র লাভের ঔষধ দিয়ে গেলেন।

**ঘ. নরখণ্ড :**

**(১) ব্যাধখণ্ড বা আক্ষটি খণ্ড**

ব্যাধখণ্ডের কাহিনির সূত্রপাত গর্ভবতী নিদয়ার সাধভক্ষণের মধ্যদিয়ে—

''নয় মাসে নিদয়ারে সাধ দেই ব্যাধ
নিদয়া স্বামীরে কহে ভাবিআ বিষাদ।''[১৮]

অবশেষে চণ্ডী ব্রাহ্মণীর বেশে এসে নিদয়ার গর্ভমোচন করলেন। নবজাত শিশুর নামকরণ করা হল কালকেতু। পাঁচমাসে তার অন্নপ্রাশন হল—

''চারি পাঁচ মাস গেল ছয় পরবেশ
অন্নপ্রাশন কৈল দিআ ছাগ মেষ।''[১৯]

ক্রমে ক্রমে কালকেতু প্রভূত পরাক্রমশালী বীর হয়ে উঠল। ধর্মকেতু তার বিবাহের জন্য কুলের পুরোহিত সোমাই পণ্ডিতকে পাত্রী দেখতে বললে সঞ্জয়কেতুর কন্যা ফুল্লরাকে নির্বাচন করলেন সবাই। শুভদিনে শুভক্ষণে কালকেতু ও ফুল্লরার বিবাহ নিষ্পন্ন হল। পুত্রবধূকে পেয়ে নিদয়া খুব খুশি। কারণ অভাবের সংসারে ফুল্লরা পরিশ্রম দিয়ে সবকিছু মানিয়ে নেয়। আনন্দিত মনে ধর্মকেতু ও নিদয়া বারাণসী প্রস্থান করলে কালকেতু তাদের জন্য মাসোহারা

পাঠায়। সংসারে দরিদ্রতা থাকলেও কালকেতু ও ফুল্লরার দাম্পত্য জীবন খুব সুখের। কালকেতু সারাদিন পশু শিকার করে আর ফুল্লরা সেই মাংস বাজারে বিক্রি করে। মৃগয়াতে কালকেতু এতটাই দক্ষ হয়ে উঠলো যে বনের পশুরা বিপদাপন্ন হয়ে তাদের রক্ষাকর্ত্রী দেবী চণ্ডীর শরণে এলো। দেবী তাদের রক্ষার আশ্বাস দিলেন। একদিন কালকেতু মৃগয়া করতে যাওয়ার পথে একটি স্বর্ণগোধিকাকে পড়ে থাকতে দেখল। দেবী বনের সব পশুকে লুকিয়ে রাখলেন।

কালকেতু ঘরের সম্বল চিন্তা করে মুষড়ে পড়ল। ফিরে আসার পথে পুনরায় সেই স্বর্ণগোধিকাকে পড়ে থাকতে দেখে লোকবিশ্বাসের জন্য এই গোধিকাকে অপয়া মনে করে ধনুকের ছিলায় নিয়ে এলেন—

‘‘জত দুঃখ পাইল আমি বনে বেড়াইআ
নেউল বদলে তোমা খাব পোড়াইআ।
এমন বিচার বীর মনেত ভাবিআ
বাঁধিল গোধিকা বীর জালদড়ি দিআ।
চারি পথ বান্ধি তারে পেলিল ধনুকে
অভয়া নাম্বিল ঊর্দ্ধপুচ্ছ হেট মুখে।
ধনুকের হুলে হেম-গোধিকা বান্ধিয়া
ঘরেরে চলিল বীর বিষাদ ভাবিআ।’’[২০]

ফুল্লরা বাড়িতে ছিল না। কুটীরের দ্বারে গোধিকাটিকে রেখে ফুল্লরার খোঁজে চললেন কালকেতু। ফুল্লরা তখন গোলাহাট থেকে বাড়িতে ফিরছিল। কালকেতু শূন্য হাতে ফিরেছে দেখে ফুল্লরা চিন্তিত হয়ে বিলাপ করতে থাকে। কালকেতু তাকে সেদিনের মতো ক্ষুদ ধার করতে বলে হাটে চলে যায়। চণ্ডী এদিকে গোধিকা মূর্তি পরিত্যাগ করে রূপৈশ্বর্যময়ী ষোড়শী নারী বেশ ধারণ করেন—

‘‘হুঙ্কারে ছিণ্ডিয়া দড়ি পড়িআ পাটের সাড়ি
সোল বৎসরের হইল রামা
খঞ্জনগঞ্জন আখি অকলঙ্ক-শশিমুখী
কেবা দিতে পরে রূপে সীমা।’’[২১]

ফুল্লরা ঘরে এসে এই অপরিচিতাকে দেখে ভীত ও বিস্মিত হয় এবং দেবীর পরিচয় জিজ্ঞাসা

করলে দেবী জানান, ইলাবৃত দেশে তাঁর ঘর। কুলীন ঘরের কন্যা হওয়ায় সতীনের জ্বালা সহ্য করতে হয় তাঁকে। ফুল্লরা অনুমতি দিলে কিছুকাল তিনি এখানেই থাকবেন—

''ইলাবৃত দেশে বসি জাতিত্র ব্রাহ্মণী
শিশুকাল হৈতে আমি ভ্রমি একাকিনী।
ব্রহ্মবংশে জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল
সাত সতা গৃহে মোর বিষম জঞ্জাল।
তুমি গো ফুল্লরা যদি দেহ অনুমতি
এক স্থানে কথোকাল করি গ বসতি।''[২২]

ফুল্লরা একথা বিশ্বাস করে এবং স্বামী গৃহ পরিত্যাগের বিরোধিতা করে। দেবী বলেন, তিনি কালকেতুর দারিদ্র্য দূর করতে এসেছেন। ফুল্লরা দেবীকে বলেন, নারীর কাছে তার শ্বশুর বাড়ি স্বর্গতুল্য এবং সতিনীর কোন্দলে ঘর ছেড়ে পালালে ক্ষতি যে তারই—

''সতিনি কন্দল করে দুগুন বলিবে তারে
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি
কোপে কইলে বিষপান আপনি তেজিবে প্রাণ
সতিনির কি হইবে হানি।''[২৩]

কিন্তু দেবী বলেন নিজের ভালমন্দ তিনি নিজেই জানেন। আর কালকেতুই 'নিজগুণে' তাকে বেঁধে নিয়ে এসেছে এবং দেবী বলেন নিজের ধন দিয়ে তিনি কালকেতুর দুঃখ নিবারণ করবেন। এসব কথায় ভীত হয়ে ফুল্লরা দেবীকে বারমাসের দুঃখ কথা শোনান—

''বৈশাখে বসন্ত ঋতু খরতর খরা
তরুতল নাহি মোরে বারিতে পসরা।
পা পোড়ে খরতর রবির কিরণ
শিরে দিলে নাই আঁটে খুঞার বসন।
বৈশাখ হইল মোরে বিষ
মাঁস না বিকায় সভে করে নিরামষে।''[২৪]

এইভাবে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ সহ মোট বারো মাসের দুঃখ বর্ণনা করেছে ফুল্লরা। কিন্তু চণ্ডী নিজ সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন। তিনি কালকেতুর গৃহে থাকবেন। ফুল্লরা কাঁদতে কাঁদতে

গোলাহাটে যায় এবং কালকেতুর কাছে অভিযোগ করে। ক্ষিপ্ত হয়ে কালকেতুকে বলে—

''পিপিড়ায় পাক উঠে মরিবার তরে
কাহার সোলস্যা কন্যা আনিআছ ঘরে।
এতদিনে মহাবীর পাপে গেল মন
আজি হইতে হইলে তুমি লঙ্কার রাবণ।''[২৫]

এই অভিযোগে কালকেতু তৎক্ষণাৎ রুষ্ট হয় এবং প্রকৃতপক্ষে কি ব্যাপার ঘটেছে তা দেখার জন্য ফুল্লরার সঙ্গে বাড়িতে আসে। চণ্ডীকে দেখে কালকেতু হতবাক, বিস্ময়ে বলে—

''আমি ব্যাধ নিচ জাতি তুমি রামা কুলবতী
পরিচয় মাগে কালকেতু
ত্রিভুবনে এক ধন্যা কিবা দেব দ্বিজ কন্যা
ব্যাধের কুটিরে কিবা হেতু।
ব্যাধ হিংসক রাড় চৌদিকে পশুর হাড়
এই ঘর সসান সমান
কহি আমি হিতবাণী এই ঘরে ঠাকুরাণী
ছুঞিলে উচিত হয় স্নান।''[২৬]

চণ্ডীকে অস্পৃশ্য ব্যাধের আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে বলে কালকেতু। দেবী সেই অনুরোধ রক্ষা না করলে ক্রুদ্ধ কালকেতু দেবীকে লক্ষ্য করে তীর যোজনা করলে দেবী নিজের আসল পরিচয় দিলেন এবং তিনি কালকেতুকে বর দিতে উপস্থিত হয়েছেন সেকথাও জানালেন। কালকেতুর মনে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। সে দেবীর মুখেই দেবীর শতনাম শুনতে চায়। কালকেতুর সংশয় দূর করতে দেবী মহিষমর্দিনী রূপ ধারণ করলেন—

''মহিষমর্দিনী রূপ ধরেন চণ্ডিকা
অষ্ট দিকেতে শোভে অষ্ট নায়িকা।''[২৭]

দেবী দুর্গামূর্তি ধারণ করলে কালকেতু ও ফুল্লরা দেবীর পায়ে প্রণাম করে। দেবী একটি মাণিক্য-অঙ্গুরী দিলে ফুল্লরা বলে এর দ্বারা তাদের কোন অভাব যাবে না। তখন দেবী তাদের সাত ঘড়া ধন দিলেন। কালকেতু অঙ্গুরীটি বণিক মুরারী শীলের কাছে বিক্রি করতে গেলে প্রথমে মুরারী কালকেতুকে অঙ্গুরীর সঠিক মূল্য দিতে চায় না। অবশেষে দেবীর

দৈবাদেশ পেয়ে মুরারী কালকেতুকে সঠিক টাকা দেয়। সেই সঙ্গে দেবী কালকেতুকে বন কেটে গুজরাট নগর নির্মাণ করার আদেশ দেন।

কালকেতু রাজা হলেও তাঁর রাজ্যে প্রজার বড় অভাব। তাই চণ্ডীকে আহ্বান করে প্রজা অধিষ্ঠানের প্রার্থনা জানালো। দেবী কলিঙ্গনগরে ঝড় বৃষ্টি সৃষ্টি করে প্রজাদের দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলে সেই প্রজাদের গুজরাটে আনতে উদ্যত হলেন এবং সহায়তার জন্য গঙ্গাকে আহ্বান করলেন। কিন্তু গঙ্গা রাজি হলেন না। তখন দেবী ভগবতী সমুদ্র ও ইন্দ্রের কাছে গিয়ে মনস্কামনার কথা জানালেন। ইন্দ্রের আদেশে মেঘ ও বজ্র আহুত হয়ে কলিঙ্গে প্রবল বন্যার সৃষ্টি করল। কলিঙ্গরাজ নদনদীকে পূজায় সন্তুষ্ট করলে বন্যার জল সাগরে ফিরে গেল। কলিঙ্গবাসীরা পার্শ্ববর্তী গুজরাট রাজ্যে চলে যায়। বুলান মণ্ডলের নেতৃত্বে কলিঙ্গের নানা প্রান্ত থেকে বিভিন্ন শ্রেণির মুসলমান ও বিবিধ গোত্রের হিন্দু গুজরাটে আসে। বিভিন্ন শিল্পী, কারিগর ও উৎপাদক শ্রেণিও আসতে থাকে। ভাঁড়ু দত্ত নামে এক শঠ ও প্রবঞ্চকও আসে এবং রাজার প্রিয়পাত্র হতে চায়। সে তার বংশগরিমা ঘোষণা করে হাটুরিয়াদের ওপর অন্যায় নির্যাতন করতে থাকে। এই সংবাদ পেয়ে কালকেতু ভাঁড়ুকে ডেকে পাঠায় এবং অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। ক্রুদ্ধ ভাঁড়ু কালকেতুর সর্বনাশের সংকল্প করে কলিঙ্গরাজের কাছে গিয়ে ষড়যন্ত্র করে। কলিঙ্গ নৃপতি গুজরাটে দূত পাঠায় এবং কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গরাজের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কলিঙ্গের সেনারা পরাজয় বরণ করে। ভাঁড়ু কোটালকে পুনরায় আক্রমণের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। এক লক্ষ টাকা ঘুষ খাওয়ার অপবাদ সৃষ্টি করে ভাঁড়ু যুদ্ধের পরিবেশ ফিরিয়ে আনে। নতুন করে কলিঙ্গ সেনা গুজরাট আক্রমণ করলে ফুল্লরার মনে সন্দেহ দেখা দেয়। এর পেছনে অন্য কোনও কারণ আছে বলে সে কালকেতুকে রামায়ণের উদাহরণ দিয়ে বোঝায়—

‘‘কহি আমি সবিশেষ জদি না ছাড়িবে দেশ
রামায়ণ শুনহ ইতিহাস।
সুগ্রীবে জিনিঞা রণে বালি না মারিল প্রাণে
আরোপিল হৃদয়ে পাষাণ
বিষম সমরে ধীর কিচ্‌কিন্দা আইল বীর
জয়ঘন্টা বাজাইআ নিসান।

সুগ্রীব পলাইআ জায় আশ্বাসিল রাম তায়

সখ্যভাব দুঙ্গে ঋষ্যমুকে

সুগ্রীব রামের তেজে বাল্যের দুয়ারে গর্জে

ধায় বালী রণ অভিমুখে।...”[২৮]

ফুল্লরার দুর্বুদ্ধিতেই কালকেতু যুদ্ধ পরিত্যাগ করে আত্মগোপন করে ও ধান্যঘরে আশ্রয় নেয়। গুজরাট নগরীতে যুদ্ধের কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে কোটালের মনে সংশয় দেখা দেয়। সে সেনাগণকে আশ্বাস দেয় যুদ্ধে কালকেতুকে অবশ্যই পরাজিত করবে। ভাঁড়ু চালাকি করে এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে খবরাখবর নিতে থাকে। ফুল্লরার কাছে গিয়ে তার হিতাকাঙক্ষী সেজে জেনে নেয় কালকেতু কোথায় আছে। ভাঁড়ুর বিলম্ব দেখে কোটাল গুজরাট নগরী আক্রমণ করে। কালকেতু বীরত্বের সঙ্গে একাই যুদ্ধ করে। যুদ্ধে তাঁর জয় সুনিশ্চিত হয়, কিন্তু চণ্ডী ভাবলেন যে নীলাম্বরের অভিশাপের কাল প্রায় অতিক্রান্ত হতে চলেছে কিন্তু তাঁর মাহাত্ম্য এখনো প্রচারিত হল না। পদ্মার সঙ্গে যুক্তি করে দেবী বীরের বল হরণ করলেন, কোটাল কালকেতুকে বন্দী করল। কালকেতু বন্দী সে সংবাদ শুনে ফুল্লরা কোটালকে অনুরোধ করে তাঁর স্বামীকে যেন ছেড়ে দেওয়া হয় এবং যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েও দেয় যে তাদের কোনো অপরাধ নেই। কালকেতু রাজ বন্দী হওয়ায় কোটাল তাকে ছাড়তে পারে না। কিন্তু ফুল্লরাকে সান্ত্বনা দেয় যদি সে কলিঙ্গরাজকে বুঝিয়ে কালকেতুর প্রাণ রক্ষা করতে পারে। কিন্তু বিচারে কালকেতুর মৃত্যুদণ্ড হয়। কারাগারে বসে অতীতের ব্যাধ জীবনকে স্মরণ করতে থাকে কালকেতু এবং বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য দেবী চণ্ডীর চৌতিশা স্তুতি করে। চণ্ডী কারাগারে এসে জানান-ব্যাধ জীবনে কালকেতু অসংখ্য পশু হত্যা করেছিলেন তাই তাঁকে এই শাস্তি ভোগ করতে হল এবং কাল প্রভাতেই কলিঙ্গরাজ সসম্মানে তাকে গুজরাট দেশে নৃপতি ঘোষণা করবে। দেবী স্বপ্নে কলিঙ্গরাজের মনে ভীতি সঞ্চার করলেন। পাত্র-মিত্ররা বোঝাল কালকেতু কোনো মানব সন্তান নয় - দেবপুত্র। তাই অবিলম্বে তাঁকে মুক্ত করা হোক। প্রভাতে কলিঙ্গরাজ কারাগারে গিয়ে কালকেতুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অবশেষে কালকেতুকে রাজসম্মানে গুজরাটে পাঠানো হল। প্রাসাদে প্রবেশ করতে গিয়ে কালকেতু দেখলেন মৃত সৈনিকের বিধবা পত্নীরা অনুমৃতা হতে চলেছে। তাদের দুঃখ দেখে কালকেতু দেবীকে স্মরণ করলে তিনি সৈন্যদের পুনর্জীবন

দান করলেন। চারিদিকে আনন্দোৎসবে কলরবে মুখরিত হয়ে উঠল। ভাঁড়ু আবার কালকেতুর হিতাকাঙক্ষী বলে নিজেকে প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু তার কপট ও ভণ্ডামি সকলের কাছে প্রকাশ করে কালকেতু প্রকাশ্যে ভাঁড়ুকে অপমান করল এবং নির্দেশ দিল ভাঁড়ুকে যেন মাথা মুড়িয়ে দুই গালে চুন-কালি মাখিয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়। সেই আদেশমত নাপিত অশ্বমূত্রে মাথা মুড়িয়ে দেয় এবং অন্যান্য সকলে নানাবিধ উপায়ে তাকে অপমান করে। ভাঁড়ুর কাতর আর্জিতে কালকেতু অবশেষে দয়াপরবশ হয়ে তাকে ক্ষমা করে এবং সবকিছু ফিরিয়ে দেয়। নীলাম্বরের অভিশাপের কালক্রমে অতিক্রান্ত হয়। চণ্ডী স্বপ্নে কালকেতুকে পূর্ববৃত্তান্ত বলে স্বর্গে ফিরে আসতে নির্দেশ দেন। নীলাম্বর ছায়াকে নিয়ে পুষ্পক বিমানে চেপে যাত্রা করলেন ইন্দ্রপুরীতে। সেখানে ইন্দ্র ও শচী পুত্র ও পুত্রবধূকে বরণ করে নিলেন। এভাবে নীলাম্বরের দ্বারা দেবী চণ্ডীর পূজা মর্ত্যভূমিতে চারিদিকে প্রচারিত হল।

**২. বণিক খণ্ড :**

স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের সুরম্য সভায় অপ্সরা রত্নমালা দেবতাদের মনোরঞ্জনের জন্যে নৃত্য প্রদর্শন করছিলেন। নারদের অপূর্ব গীত ও বাণীধ্বনির সঙ্গে তাঁর দেহবিভঙ্গ কমনীয় সৌন্দর্য লাভ করছিল। ঠিক এই সময়ে দেবী চণ্ডীর নির্দেশে কামদেব মদন ফুলশর নিক্ষেপ করলেন এবং রত্নমালার অঙ্গ অবশ হল। ফলে নৃত্যের তাল ভঙ্গ হল। লজ্জায় অধোমুখী অপ্সরাকে দেখে দেবগণের মন দুঃখিত হলো কিন্তু দেবী তালভঙ্গের কারণে ক্রুদ্ধ হয়ে রত্নমালাকে অভিশাপ দিলেন—

> ‘‘যৌবন গরবে নাচ হইআ অভিমানী।
> ধর্মসভায় নাচ হইআ খলমতী
> মানব হইআ জন্ম চল বসুমতী।
> হেন বাক্য বৈল যদি সর্বমঙ্গলা
> চরণে ধরিআ স্তুতি করে রত্নমালা।’’[২৯]

অভিশপ্ত হয়ে দেবীর চরণে কাকুতি-মিনতি করেও কোন ফল হলো না। অতএব দেবীর কথা মতো পৃথিবীতে দেবীর পূজা প্রচারে সহায়িকা হয়ে ইছানি নগরে বণিক লক্ষপতির ঘরে খুল্লনা রূপে জন্মগ্রহণ করলেন।

ভ্রমরার কূলে উজানি নগরে বণিক ধনপতির পূর্বপুরুষের বাস। গৌড়ের রাজা বিক্রম কেশরীর অধীনস্থ অঞ্চল উজানি। ধনপতির পূর্বপুরুষেরা বহিঃবাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ-উপার্জন করলেও ধনপতির মধ্যে সেরকম বৈভব সঞ্চয়ের ইচ্ছা জাগ্রত হয়নি। অন্যদিকে ইছানি নগরে লক্ষপতির ঘরে রত্নমালা খুল্লনা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ধনপতি অভ্যস্ত ছিলেন ধনী ঘরের সন্তানদের মতো বিলাস ব্যসনে। তাঁর শখ ছিল পায়রা ওড়ানো। ধনপতি বিবাহিত, তাঁর স্ত্রীর নাম লহনা। লহনা সন্তানহীনা, তাঁর যৌবন অতিক্রান্ত হয়েছে। তাই ধনপতির কাছে লহনার গুরুত্ব বেশ কমে গেছে। একদিন ধনপতি বন্ধুদের সাথে পায়রা ওড়াতে ব্যস্ত ছিলেন। পায়রাগুলির মধ্যে একটি পায়রা শ্যেন পাখির ভয়ে ভীত হয়ে ধূলিক্রীড়ারত সদ্যযৌবনা খুল্লনার আঁচলে আশ্রয় নিল। ধনপতি খুল্লনার কাছে পায়রা ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ জানালেন, এবং প্রণয় নিবেদনও  করলেন। খুল্লনা পায়রা ফিরিয়ে দিতে অসম্মত হল। কারণ আশ্রিতকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করা তার স্বভাবধর্ম। তাছাড়া সে পায়রাটিকে চুরি করেনি। তার কাছে এটি দৈবপ্রদত্ত। অতএব তিনি প্রত্যর্পনে বাধ্য নয়। ধনপতি নিজ গৃহে ফিরে গেলেও স্ফুটিত যৌবনা খুল্লনাকে দেখে তাঁর হৃদয় বিচলিত হয়ে পড়ল। খুল্লনার পিতা লক্ষপতি সম্পর্কে আত্মীয়। ধনপতি অবশেষে ব্রাহ্মণ দনাই ওঝাকে পাঠালেন লক্ষপতির কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। লক্ষপতির মনে সংশয়ের সৃষ্টি হল। একে দোজবর তাঁর ওপর তাঁরই জামাই। কিন্তু অতুল ধনসম্পত্তির কথা ভেবে তিনি মন মনস্থির করলেন ধনপতির সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দিবেন। সে সংবাদ জানতে পেরে খুল্লনার জননী রম্ভাবতী স্বামীর প্রতি ক্ষুব্ধ হলেন—

‘‘খুল্লনা বাঁন্ধিআ গলে ঝাঁপ দিব গঙ্গাজলে
নাঞি দিব দারুন সতিনে
দুরন্ত ঝিয়ের মোহ নয়নে গলয়ে লোহ
লক্ষপতি ধরিআ চরণে।’’[৩০]

লক্ষপতি বলেন, খুল্লনার স্বাভাবিক বিবাহ অমঙ্গলজনক, তার অকাল- বৈধব্যযোগ একমাত্র খণ্ডিত হতে পারে দোজবরে বিবাহ দিলে। গণকের জ্যোতিষ বিচারে এই সিদ্ধান্তই রয়েছে। রম্ভাবতী সন্তানের মঙ্গল চিন্তায় ব্যাকুল। শেষ পর্যন্ত এই বিবাহে সম্মতি দিলেন। ধনপতি এলেন লক্ষপতির গৃহে। রম্ভাবতী হবু জামাতাকে অভ্যর্থনা জানালেন। ধনপতির রূপ দেখে

এয়োরা নিজ নিজ পতির নিন্দায় মুখর হল। এদিকে লহনা লোকমুখে স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের কথা জানতে পারলেন। তিনি দাসী দুর্বলার কাছে এর থেকে পরিত্রাণের উপায় জানতে চাইলেন। সতীন কাঁটার যন্ত্রণায় লহনা কাতর। ধনপতি ঘরে ফিরে এলে লহনাকে ডাকেন। কিন্তু ক্রোধে ও অভিমানে লহনা তার ডাককে উপেক্ষা করেন। ধনপতি প্রথমা পত্নীর মন জয় করার জন্য ছলনার আশ্রয় নিলেন—

''যুক্তি যদি লয় মনে কহিবে প্রকাশি
রন্ধনের তরে আমি আন্যা দিব দাসী।
সদাগর বলে জত কপট প্রকাশ
উত্তর না দেই রামা ছাড়এ নিঃশ্বাস।''[৩১]

ধনপতি বললেন লহনার ভবিষ্যৎ সুখের জন্যই তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করছেন। সতীন খুল্লনা তার দাসী হয়েই থাকবে। একথায় ক্ষোভে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করল ধনপতিকে। অভিমান বেশিক্ষণ থাকল না। মান ভাঙাতে ধনপতি লহনাকে দিলেন পাটের শাড়ি আর পাঁচ পল সোনার চুড়ি, সেই সঙ্গে কপট বচন—

''সাধু বলে প্রিয় তুমি আছ মোর মনে
পূর্বে আছিলে জেন বিবাহের দিনে।''[৩২]

এইভাবে কৌশলে ধনপতি লহনার কাছে দ্বিতীয় বিবাহের সম্মতি আদায় করে নিলেন। দনাই ব্রাহ্মণ এসে বিবাহের লগ্ন স্থির করে দিল। শুভদিনে শুভক্ষণে নির্বিঘ্নে বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। খুল্লনাকে নিয়ে গৃহে ফিরলেন বণিক। লহনা সতীন-কাঁটার প্রভাব কাটানোর জন্য স্বামীকে বশ করতে নানাবিধ ঔষধ-এর ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

দ্বিতীয় বিবাহের কিছু পরে নানাপ্রকার উপঢৌকন নিয়ে রাজার কাছে গেলেন ধনপতি। রাজা বিক্রমকেশরী সভায় শুক ও সারিকে নিয়ে খগান্তক ব্যাধের গল্প শুনতে ব্যস্ত। শুকের নীতিজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে রাজা বিস্মিত ও অভিভূত। এমন সময় শুক সকলকে চমকে দিয়ে মানুষের ভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বচনে প্রহেলিকা বললে রাজাসহ সমগ্র সভাসদরা খুশি হলেন। শুকের মুখ থেকে সবাই শ্রীবৎস চিন্তার কাহিনি শ্রবণ করলেন। রাজা মুগ্ধ হয়ে শুক ও সারিকে নিজের প্রাসাদে রাখার জন্য ধনপতিকে অনুরোধ করলেন পাখি দুটির জন্য যেন গৌড় নগর থেকে দুটি স্বর্ণ পিঞ্জর বানিয়ে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। সদ্য বিবাহিত

ধনপতি প্রথমে গৌড়ে যেতে রাজি হলেন না। শেষে সভাদলের চাপে পিঞ্জরের জন্য প্রয়োজনীয় স্বর্ণ নিয়ে গৌড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। দূতের মুখে লহনার কাছে সংবাদ পাঠালেন। গৌড়রাজের মনোরঞ্জনের জন্যে রাজ-উপঢৌকন নিয়ে ধনপতি যথাসময়ে দরবারে হাজির হলেন। গৌড়রাজ বণিকের প্রার্থনা অনুযায়ী কারিগরদের ডাকলেন। কারিগররা স্বর্ণ পিঞ্জর বানানোর জন্য ছয় মাস সময় চেয়ে নিল। এই ছয় মাস ধনপতি গৌড়রাজের আতিথেয়তায় সমাদরে ভোগসুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

এদিকে স্বামীর নির্দেশ মতো লহনা খুল্লনাকে অত্যন্ত যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করতে লাগল। এদিকে দুর্বলা ভাবলো দুই সতীনের মিত্রতায় তার দৈহিক পরিশ্রম বাড়বে। তার দৈহিক পরিশ্রম যাতে বৃদ্ধি না পায় সে জন্য দুই সতীনের মধ্যে একটা কোন্দল বাধাতে সচেষ্ট হলেন। সংসারের কত্রী লহনাই। কিন্তু বিগতা যৌবনা লহনার তুলনায় নব-যৌবনা খুল্লনা যে ধনপতির প্রিয় স্ত্রী হয়ে উঠবে সেকথা দুর্বলা দাসী বুঝতে পেরেছিল। এই কথা বলে লহনার কান ভারী করে করে দুই সতীনের মধ্যে কোন্দল বাধানোর চেষ্টা করল। সতীনের সঙ্গে এত মাখামাখি ভাল নয় এবং এত উদারতা প্রদর্শন সর্বনাশের কারণ হতে পারে—

> ‘‘নানা উপভোগ দিআ পোষহ সতিনী
> আপনার কার্য নাশ করিলে আপনি।
> সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে
> সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে
> অবশেষে অই তোমা বধিব পরানে।’’[৩৩]

তাই গৌড় থেকে ধনপতি ফিরলে লহনা নয়, খুল্লনাই সংসারের কত্রী হবে, বণিকের কাছে কাঙিক্ষত হয়ে উঠবে সেটাই স্বাভাবিক। ফলে লহনার মন ঈর্ষায় ভরে উঠল। শঙ্কিত লহনা স্বামীকে বশে আনার জন্য দুর্বলাকে পাঠাল সখী ব্রাহ্মণী লীলাবতীর কাছে। কিন্তু লীলাবতীর ওষুধেও লহনা আশ্বস্ত হল না, অন্যভাবে স্বামীর মন অধিকারের কথা ভাবতে লাগলেন। খুল্লনার রূপ বিনষ্ট হলে তার প্রতি ধনপতির আকর্ষণ হ্রাস পাবে তা ভেবে লীলাবতীকে দিয়ে স্বামীর ব-কলমে একটি মিথ্যা পত্র লিখিয়ে নিলেন। যে পত্রে রয়েছে গৌড়ে আরো কিছুকাল থাকতে হবে ধনপতিকে। স্বর্ণপিঞ্জরের জন্য রাজপ্রদত্ত স্বর্ণে অকুলান হওয়ায় পত্নীর ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কার পাঠাতে বলেছে এবং খুল্লনাকে বিবাহ করে তিনি অনুতপ্ত। রাহুগ্রস্থকালে

এই বিবাহ হওয়ায় তা অমঙ্গলদায়ক হয়েছে, দুষ্ট গ্রহের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় খুল্লনা যদি ছাগলদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। সে পড়বে খুঞা বসন, খাবে আধপেটা ভাত আর শয়ন করবে ঢেঁকিশালে। খুল্লনার চিঠি পড়ে বুঝতে অসুবিধা হল না এটা লহনার কারসাজি, শুরু হল দুই সতীনের কোন্দল। লহনা খুল্লনার চুল ধরে লাথি-কিল মারতে লাগল। কেড়ে নিল তার সব অলঙ্কার। খুল্লনা বিপন্ন হয়ে দুর্বলাকে দিয়ে মায়ের কাছে খবর পাঠাতে চাইলেন। দুর্বলা খুল্লনাকে ছাগল চড়ানোর পরামর্শ দিল। খুল্লনাও ভিখারির বেশে ছাগল চড়াতে শুরু করলো। এদিকে রম্ভাবতীর কাছে সে খবর গেলে তিনি দুঃখিত হলেন এবং এর কোনো প্রতিকার নেই জেনে নিশ্চেষ্ট রইলেন। শুরু হল খুল্লনার ওপর লহনার নির্যাতন—

"উদরে দহন পোড়ে অনুক্ষণ
তৈল বিনে ঘোরে মাথা
কি বিধি নিষ্ঠুর লবণ কর্পূর
কারে কবে দুঃখ কথা।"[৩৪]

মানসিক নির্যাতন, অনাহারে রাখা থেকে শুরু করে নানা প্রকার যন্ত্রণা সবই প্রয়োগ করা হল। রূপসী খুল্লনাকে মোহময়ী প্রকৃতিও বিভিন্ন ঋতুতে কামোদ্দীপনা জাগিয়ে পীড়া দিতে শুরু করল। খুল্লনা নিরুপায় হয়ে তার দুর্ভাগ্যকে মেনে নিতে বাধ্য হলেন। একদিন বনের মধ্যে ছাগল চরাতে চরাতে অতিশয় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন খুল্লনা। দেবী চণ্ডী রম্ভাবতীর বেশ ধরে খুল্লনাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে জানালেন সর্বশী নামে ছাগলটিকে শৃগালে খেয়ে ফেলেছে। নিদ্রাভঙ্গের পর ছাগলটিকে বনের মধ্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন। দৈবমায়ার কারণে সর্বশীকে পাওয়া গেল না। বরং খুল্লনা দেখতে পেলেন বনের এক প্রান্তে বনকুমারীরা কীসের যেন পুজো করছে। এই কুমারীরা হলেন ইন্দ্রের পঞ্চকন্যা। খুল্লনার প্রশ্নের উত্তরে তারা জানাল দেবী মঙ্গলচণ্ডীর পুজো করছে তারা। যাঁর কৃপায় হারানো জিনিস ফিরে পাওয়া যায়। একথা শুনে আনন্দিত চিত্তে বনের মধ্যেই অনাড়ম্বরভাবে দেবীর পুজো করলেন। দেবী খুশি হয়ে তাকে বরদান করলেন এবং লহনার শিয়রে উপস্থিত হয়ে তাকে শাস্তির ভয় দেখালেন। দেবীর কৃপায় সর্বশীকে ফিরে পেয়ে খুল্লনা বাড়ি ফিরে এলে লহনা তাকে স্নান করিয়ে আহারের উত্তম ব্যবস্থা করেন—

''হরিদ্রা চন্দন তৈল আনিল দুবলা।
খুল্লনার অঙ্গে দিআ দূর কৈল মলা
আট দিগে নানা কর্ম করে দাসীগণ
স্নান করে পরে রামা পবিত্র বসন।''[৩৫]

দেবীচণ্ডী গৌড়ে খুল্লনার বেশে ধনপতিকে স্বপ্নে দেখা দিলেন। ধনপতি স্বর্ণপিঞ্জর নিয়ে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করলেন—

''খুল্লনা লহনা বিনে অন্য নাহী মানে
ছয় দিবসের পথ আইল দুই দিনে।''[৩৬]

অন্যদিকে ধনপতির গৃহে প্রত্যাবর্তনের বার্তা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লহনা স্বামীর প্রিয়পাত্রী হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল। দুর্বলা আবার কূটবুদ্ধি দিতে শুরু করল। সে জানত যৌবনাবতী খুল্লনা সহজেই ধনপতির মনকে হরণ করবে তাই খুল্লনার কাছে এসে লহনার নামে গালি দিতে লাগল এবং পরামর্শ দিল সুসজ্জিত হয়ে স্বামীর কাছে যেতে। ধনপতি খুল্লনার প্রতি প্রসন্ন হলেন। দুর্বলা এ সংবাদ দিতে ছুটল লহনার কাছে। লহনাকে তাতিয়ে তোলাই তার উদ্দেশ্য। ঈর্ষাকাতর হয়ে লহনা দুর্বলার সাহায্যে সজ্জিত হয়ে পাটশালে এসে দেখা করলেন স্বামীর সঙ্গে এবং জানাল কীভাবে স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে খুল্লনার দেখা শোনা করেছে। গৃহে ফিরে ধনপতি খুল্লনাকে রন্ধন করতে নির্দেশ দিলেন। চণ্ডীর নাম স্মরণ করে রান্না শুরু করলেন খুল্লনা। ভোজনের শেষে নববধূর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন ধনপতি। এদিকে লহনা রতির ভয়ঙ্করতা বিষয়ে খুল্লনার মনে ভীতির সঞ্চার করল। কিন্তু খুল্লনা সে বাধা মানল না। এদিকে প্রতীক্ষা করতে করতে ধনপতি ঘুমিয়ে পড়লেন। ধনপতিকে দেখে খুল্লনা হতভাগ্য জীবন নিয়ে বিলাপ করতে লাগল এবং স্বামীর ঘুম ভাঙলে লহনার অত্যাচারের কথা স্বামীকে সব জানালেন প্রমাণ স্বরূপ জাল-পত্রটি দেখালেন। পত্র পাঠ করে ধনপতি লহনার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, স্বামীর কাছে খুল্লনা তার বিগত বারোমাসের দুঃখ নিবেদন করলেন। লহনা সমস্ত কিছু দরজার আড়াল থেকে শুনছিলেন, এবার সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ধনপতির সঙ্গে বচসায় রত হলেন অপগত যৌবনা বলে তিনি স্বামীর সোহাগ থেকে বঞ্চিত। ধনপতি ক্রুদ্ধ হয়ে লহনাকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বললেন। লহনাও খুল্লনার চাল-চলন নিয়ে নানা প্রশ্ন করে স্বামীর মন বিষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। পরিশেষে সদাগরের

ভর্ৎসনায় লহনা স্নান ত্যাগ করলেন। খুল্লনার সঙ্গে ধনপতি পাশা খেলতে বসলেন এবং খেলা শেষে উভয়ে মিলিত হলেন।

অবশেষে লহনা বুঝতে পারল যৌবনহীনতাই তার অনাদরের প্রধান কারণ। তিনি গোপনে দুর্বলাকে পাঠালেন লীলাবতীর কাছে। এদিকে লহনাকে ভর্ৎসনা করে ধনপতিও খুশি নন, লহনার মনকে শান্ত করতে তিনি সচেষ্ট হলেন। ধনপতির বাক্যে লহনার অভিমান দূর হল এবং তারা মিলিত হলেন। ধনপতি দুই পত্নী নিয়ে সুখে প্রায় চারমাস অতিবাহিত করেছেন।

এরপর কাহিনির আরেকটি নতুন অধ্যায় শুরু হল। দেবলোকে ইন্দ্র পুত্র মালাধর কালীয়দমন পালায় কৃষ্ণ সেজে অভিনয় করতে গিয়ে শিবের হাড়মালা পরিহিত মূর্তি দেখে হেসে ফেলে। মহাদেব তাঁর  প্রতি ক্রোধান্বিত হলেন। মালাধর এই কাজ করেছে ভেবে তাঁকে বণিক গৃহে জন্মানোর অভিশাপ দিলেন। মালাধর অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে মহাদেব বলেন ধরাতলে তাঁর সেবক ধনপতির স্ত্রী খুল্লনার গর্ভে জন্ম হবে মালাধরের এবং চণ্ডীর ব্রত প্রচার করে আবার স্বর্গে ফিরে আসতে পারবে। অতএব নিরুপায় হয়ে মালাধর মহাসমাধিতে দেহ ত্যাগ করে খুল্লনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করল। আর তাঁর পত্নী সুশীলা ও জয়াবতী যথাক্রমে সিংহল রাজ শালিবাহন ও উজানিরাজ বিক্রমকেশরীর ঘরে জন্মগ্রহণ করল। একদিন দনাই পণ্ডিত বণিকের বাড়িতে এসে ধনপতির বাৎসরিক পিতৃ শ্রাদ্ধের প্রস্তাব করলেন। শ্রাদ্ধসভায় শুরু হল নানা ধন্যাঢ্য ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রকার খোশ গল্প ও টীকাটিপ্পনী দিয়ে। সেখানে খুল্লনার ছাগল চড়ানো নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলল। অনেকেই বললেন খুল্লনাকে ঘরে ঠাঁই দিয়ে ধনপতি সামাজিক বিধান লঙঘন করেছে। এরকম অবস্থায় ধনপতিকে জাতে উঠতে গেলে হয় এক লক্ষ তঙ্কা দিয়ে বণিক সমাজকে খুশি করতে হবে নয়তো খুল্লনাকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হবে। কিন্তু খুল্লনা বুঝতে পেরেছিল এই অর্থলোভী বণিক সমাজ শুধুমাত্র একবার ধন গ্রহণ করে ধনপতিকে নিষ্কৃতি দেবে না। সেজন্য খুল্লনা চরিত্রের পরীক্ষা দিতে সম্মত হল। খুল্লনা দেবী চণ্ডীকে স্মরণ করলে দেবী আট নায়িকাকে সঙ্গী করে রথে চড়ে খুল্লনাকে সাহায্য করতে মর্ত্যে এলেন। প্রথমে বিষধর সর্প দংশনের পরীক্ষা, পরে তপ্ত লৌহ শলাকার পরীক্ষায় খুল্লনা জয়ী হলেন। সবশেষে জতুগৃহের অগ্নিপরীক্ষা এল। দেবীচণ্ডী বিশ্বকর্মা নির্মিত জতুগৃহে ধ্যান করে প্রবেশ করলেন খুল্লনার দেবীর কৃপায়

অক্ষত শরীরে বেরিয়ে এলেন। উপস্থিত সকলে খুল্লনার সতীত্ব বিশ্বাস করল এবং খুল্লনার রান্না করা খাবার খেতে রাজি হল। সমস্ত অতিথিদের বিদায় দিয়ে ধনপতি উপস্থিত হলেন রাজা বিক্রমকেশরীর রাজসভায়। রাজা পুরাণ কথা শ্রবণ করছিলেন। পুরাণে জ্যৈষ্ঠ মাসের মহিমা বর্ণনায় চন্দন দানের সুকৃতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাজা এই ফলাফল শ্রবণ করে ভাণ্ডারীকে চন্দন আনতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ভাণ্ডারী এসে জানালো যে রাজভাণ্ডারে কোনো চন্দন নেই। রাজা রাজসভায় উপস্থিত বণিকদের দক্ষিণ পাটন থেকে চন্দন আনতে আদেশ করলেন। ধনপতি পূর্বের অভিজ্ঞতার জন্য বিদেশ যেতে রাজি হলেন না। কিন্তু রাজা 'লোহিতলোচন' ধনপতিকে দক্ষিণে যেতে বাধ্য করল।

সিংহল যাত্রার সংবাদ লহনার কানে পৌঁছালে সে আনন্দিত হয়ে উঠল। বাড়ি ফিরে ধনপতি খুল্লনাকে সিংহল যাত্রার সংবাদ জ্ঞাপন করলেন। খুল্লনার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তিনি ছয়মাসের অন্তঃসত্ত্বা, বণিককে সিংহলে যেতে দিতে চান না। অন্যদিকে লহনা বলে শান্তিতে বাস করতে গেলে রাজার সাথে বিবাদ করে লাভ নেই। তাছাড়া ধনপতির অর্থ সঞ্চয়ের স্বপ্ন কেবল বাণিজ্যেই সম্ভব, আয়হীন ব্যায় ডেকে আনে দারিদ্র্য। খুল্লনা সম্ভাব্য বিপদের কথা ভেবে ভীত হলেন। কারণ বণিক সমাজের স্বভাব তিনি চেনে। অতএব খুল্লনার মনের কথা বুঝতে পেরে এক সন্দেহ ভঞ্জনমূলক জয়পত্র লিখে দিলেন। চিঠিতে উল্লেখ করা হল সম্ভাব্য পুত্র-কন্যার নাম। দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্যের জন্য নানা প্রকার দ্রব্য নিলেন বণিক। ডুবুরিরা এসে পুরোনো নৌকাগুলো ভ্রমরার জল থেকে তুলল। জ্যোতিষীর কথা মত শুভ দিন স্থির হল। যাত্রার প্রাক্-মুহূর্তে খুল্লনা বসলেন চণ্ডীর পুজো করতে। লহনা ধনপতিকে জানালো খুল্লনা কোনো এক ডাকিনীর পুজো করছে। ধনপতি শৈব। একথা শুনে তিনি ক্রুদ্ধ  হলেন এবং খুল্লনা যখন পূজায় ব্যস্ত তখন ঘটে পদাঘাত করে আবার ফিরে এলেন। দেবী ক্ষুব্ধ হলেন এবং ধনপতিকে কি শাস্তি দেওয়া যায় তা নিয়ে সখী পদ্মার পরামর্শ গ্রহণ করলেন। ঠিক হল ঝড় বৃষ্টিতে ধনপতির বাণিজ্য তরী ডুবিয়ে দেবেন। দেবীমায়ায় ঝড় বৃষ্টি শুরু হল এবং হনুমানের সাহায্যে দেবী ধনপতির ছয় ডিঙা ডুবিয়ে দিলেন। সদাগর কোনো ক্রমে একটা ছোটো নৌকার আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হলেন। অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে অবশেষে ধনপতির ডিঙা প্রবেশ করল কালীদহে। ধনপতি এখানে এক আশ্চর্য দৃশ্য দর্শন করলেন। এক দেবীরূপা রমণী যিনি প্রস্ফুটিত কমলদলে

উপবিষ্ট হয়ে বাম হস্তে এক হস্তীকে ধারণ করে মুখ গহ্বরে গ্রাস করছেন ও পর মুহূর্তে তাকে উদ্‌গীরণ করে দিচ্ছেন। দৃশ্যটি দেখে ধনপতি অবাক হলেন বটে কিন্তু নৌকায় উপস্থিত আর কেউ এই দৃশ্য দেখতে পেলো না—

''সুধন্য সিংহল দেশ কালিদহে পরবেশ
জল আচ্ছাদিত শতদলে।
কালিদহের জলে কুমারী কমলদলে
গজ গিলে উগারে অঙ্গনা।
অতি কৃশোদরী বালা মত্ত গজ লয়্যা লীলা
শশিমুখী খঞ্জনলোচনা।''[৩৭]

দীর্ঘ যাত্রার পর ধনপতির নৌকা ভিড়ল সিংহলে রত্নমালার ঘাটে। রাজা শালবাহনের কাছে সংবাদ পৌঁছালো। তিনি কোটালকে পাঠালেন বণিকের সংবাদ নিতে। কোটাল ধনপতিকে রাজসভায় নিয়ে এলো। ধনপতি রাজাকে বাণিজ্য বদলের প্রস্তাব দিলেন। ধনপতি রাজসভায় কালীদহের অদ্ভুত কমলে-কামিনী মূর্তিটির কথা বললেন কিন্তু কেউ বিশ্বাস করল না বরং উপহাস করল—

''বিদেশ আসিআ সাধ্বে লাগিল তরাস
কিবা ভাগ্যে তোমার ডিঙ্গা না কৈল গরাস।''[৩৮]

ধনপতি নিজেকে সত্যবাদী প্রমাণের জন্যে সকলকে সে দৃশ্য দেখাতে চাইলেন। তবে শর্ত থাকলো অসফল হলে রাজার দেওয়া শাস্তি মাথা পেতে নিতে হবে। রাজা সৈন্য-সামন্ত, পাত্র-মিত্র এমনকি অন্তঃপুরবাসিনীদের নিয়ে চললেন কালীদহে। কিন্তু দৈবীমায়ায় সদাগর কমলে-কামিনী দৃশ্যটি দেখাতে অসফল হলেন। ফলে তাকে বন্দী করা হলো। কারাগারের অন্যান্য বন্দীদের মতো তিনিও সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। দেবী চণ্ডী ধনপতিকে কারাগারে দেখা দিয়ে তাঁর পুজো করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ধনপতি শৈব তাই দেবীর পূজা করতে রাজি হলেন না—

''মহেশঠাকুর বিনু অন্য নাহি জানি।
প্রাণ জদি আমার বার্য্যায় কারাগারে
মহেশঠাকুর বিনে না ভজিব কারে।

লাজ পায়্যা অন্তরে রহিল ভগবতী
এগার বৎসর বন্দী থাক ধনপতি।''[৩৯]

অন্যদিকে খুল্লনা সপ্তম মাসের গর্ভবতী, তাই সাধভক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে উজানিতে। বিপন্ন খুল্লনা লহনার সাহায্য চাইল। লহনাও নবজাতকের আগমনের সম্ভাবনার পূর্বে হিংসা ভুলে খুল্লনার প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে উঠল। প্রসবের সময় চণ্ডী নিজেই এলেন বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে ওষুধ নিয়ে। খুল্লনা দেবীকে চিনতে পারলেন। খুল্লনা স্বাস্থ্যবান একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। সন্তান জন্মানোর পর নানা ধরনের স্ত্রী আচার শুরু হল। গণক ডেকে বিচার করে জাতকের নাম রাখা হল শ্রীপতি বা শ্রীমন্ত। লহনা ও খুল্লনার আদর যত্নে শ্রীপতি শৈশব পেরিয়ে বাল্যে উপনীত হল। সে সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে অভিনয়ে ও ক্রীড়ায় কুশলী হয়ে উঠল। দনাই ওঝার কাছে শাস্ত্রশিক্ষা চলতে লাগল। বিদ্যাশিক্ষায় অতি অল্প বয়সেই সে পারঙ্গম হয়ে উঠল। একদিন গুরুমশাইয়ের সঙ্গে তাঁর বিদ্যা নিয়ে বাদানুবাদ ঘটলে গুরু ক্রুদ্ধ হয়ে তার পিতৃপরিচয় নিয়ে কটূক্তি করলেন—

''পিতা দীর্ঘ পরবাসে তোমার জনম
নাহি জান আপনার জাতের মরম।
মর‍্যা গেল ধনপতি হইল বহু দিস
মায়ের আইয়ত গথে ভোজন আমিস।
জারুয়া চেমনে নাহী শুনাঞি পুরাণ
এই হেতু আমার এতেক অপমান।''[৪০]

একথা শুনে ক্ষুব্ধ শ্রীমন্ত গুরুকে প্রণাম না করেই পাঠশালা পরিত্যাগ করল এবং ঘরে ফিরে দুঃখে অপমানে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে কপাট দিল। এদিকে পাঠশালা থেকে সঠিক সময়ে না ফিরে আসলে খুল্লনা শঙ্কিত মনে সম্ভাব্য স্থান গুলি খুঁজে শেষে গুরুমশাইয়ের বাড়িতে গিয়ে পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করলে ব্রাহ্মণ তাকে অত্যন্ত অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। সুযোগ পেয়ে লহনাও খুল্লনার অসংবৃত বেশ-বাস নিয়ে সর্বসমক্ষে কটুক্তি করতে ছাড়ল না। খুল্লনা বাড়িতে ফিরে দেখে শ্রীমন্তের ঘর কপাট বন্ধ। অনেক সাধ্য সাধনার পর শ্রীমন্ত কপাট খুলল এবং গুরু কর্তৃক তার অপমানের কথা জানাল—

''গুরুসনে কৈল দ্বন্দ্ব গুরু মোরে বৈল মন্দ

লাজে নাহী করি নিবেদন

বন পোড়ে দেখে জন গুপ্তে পোড়ত্র মন

জীবনে নাহিক প্রয়োজন।

জারুয়া বলিআ গালি মুখে জেন চুন-কালী

করিল পণ্ডিত অপমান

তেজিব মনের দুঃখ না দেখিব লোকমুখ

করিব মাহূর বিষ পান।”[৪১]

সে পিতার সন্ধানে সিংহল পাটনে যেতে চায় এবং পিতা যে জীবিত তাও প্রমাণ করতে চায়। শ্রীমন্ত কোনো জারজ সন্তান নয়। খুল্লনা পুত্রের কথায় আকুল হয়ে উঠলেন। সিংহল যাত্রায় পথের নানা বিপদের কথাও জানালেন। কিন্তু শ্রীমন্ত নিজ সিদ্ধান্তে অনড়। দেবী চণ্ডী ডিঙা নির্মাণের জন্য বিশ্বকর্মাকে আদেশ দিলেন। বিশ্বকর্মা ও হনুমান শ্রীমন্তের বাণিজ্য যাত্রার উপযোগী ডিঙা নির্মাণ করলেন। যাত্রার শুভক্ষণ নির্ধারনের পর শ্রীমন্ত পিতার মতোই বাণিজ্য-দ্রব্য সাজিয়ে নিল। কিন্তু রাজ আদেশের প্রয়োজন। বিক্রমকেশরীর সভায় শ্রীমন্ত ভেট নিয়ে উপস্থিত হলো ও দক্ষিণ পাটন যাওয়ার জন্য সম্মতি চাইল। রাজা প্রথমে বাঁধা দিলেও তার পিতৃভক্তি দেখে অন্তিমে অনুমতি দিলেন। রাজার হাতে মাতৃগণের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করে শ্রীমন্ত বাড়িতে এল। খুল্লনা তাকে যেতে দিতে নারাজ। একমাস অপেক্ষা করতে বলে শ্রীমন্তকে কিন্তু সে মোটেও বিলম্ব করতে রাজি নয়। সে বাণিজ্য তরী সাজিয়ে রওনা দিল দক্ষিণ পাটনে। খুল্লনা চণ্ডী পুজো করতে বসলেন।

নদীর এক-একটি ঘাট অতিক্রম করে শ্রীমন্তের বাণিজ্য তরী এগিয়ে চলল বারো বছর আগে ধনপতি যে পথ দিয়ে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিংহল যাত্রা করেছিলেন সে পথ দিয়ে। শ্রীমন্তের ডিঙি প্রবেশ করল মগরায় শুরু হল প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি। দেবীর ইঙ্গিতে নদনদীতে প্রবল জলোচ্ছ্বাস শুরু হল। শ্রীমন্ত চণ্ডিকার স্তব করতে লাগল। সমুদ্র ক্রমশ শান্ত হল। ক্রমে দক্ষিণে জোঁকদহ, সর্পদহের পর শ্রীরাম জাঙ্গালে উত্তীর্ণ হল শ্রীমন্তের নৌকাগুলি। অবশেষে কালীদহে প্রবেশ, বারো বছর আগে ধনপতি যেখানে কমলে-কামিনীর অদ্ভুত মূর্তি দর্শন করেছিলেন, শ্রীমন্তও সেই একই দৃশ্য দেখল। তারপর এলো সিংহলের রত্নমালার ঘাট। সেদেশের কোটালের সঙ্গে শ্রীমন্ত রাজসভাতে এলো। সেখানে আত্মপরিচয় পর্বের

পর অগ্নিশর্মা পুরোহিত জানতে চাইলেন পথের অভিজ্ঞতার কথা। শ্রীমন্ত কমলে-কামিনী দর্শনের কথা জানাল। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করলো না তার কথা। শ্রীমন্ত সবার সামনে প্রতিজ্ঞা করল সেই অদ্ভুত দর্শন মূর্তিটি দেখাতে না পারলে রাজার শাস্তি গ্রহণ করবে—

''শ্রীমুখের আজ্ঞা জদি কর নৃপবর
কমলকুসুমে আমি ছায়্যা দিব ঘর।
রাজসভার জুগ্য নহে এই সাধু ভণ্ড
ধর্ম শাস্ত্রে বিচার উচিত হয় দণ্ড।
সাধু বলে ভণ্ড বল ঠাকুরালি বলে
প্রতিজ্ঞা করিআ চল কালিদহের জলে।
জদি মিথ্যা হয় তবে নুটি করিহ ধন
মসানে কোটল দিআ বধিব জীবন।''[৪২]

চণ্ডীর কৌশলে শ্রীমন্ত সেদৃশ্য দেখাতে অসমর্থ হল। রাজা কোটালকে নির্দেশ দিলেন শ্রীমন্তকে যেন মশানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়। মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিরূপায় হয়ে শ্রীমন্ত দেবী চণ্ডীকাকে স্মরণ করল, বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য চৌতিশা স্তবে প্রার্থনা জানাল। স্বর্গে দেবীর আসন টলে উঠল। তিনি পদ্মার পরামর্শে রণবেশে সিংহল যাত্রা করবেন বলে মনস্থির করলেন। কিন্তু অবশেষে নারদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে সিংহল রাজের মশানে উপস্থিত হলেন এবং কোলে তুলে নিলেন শ্রীমন্তকে। কোটাল ও তার অনুচরেরা বৃদ্ধাকে ঠেলে ফেলে দিল ও শ্রীমন্তের দেহে অস্ত্রাঘাত করল। কিন্তু চণ্ডীর কৃপায় অক্ষত রইল তার দেহ। অবস্থা বেগতিক বুঝে কোটালের দল যুদ্ধে এগিয়ে এল। দেবী চণ্ডীও তাদের অনুচরদের নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন কোটাল ও কোটালের ভাইদের সঙ্গে। সিংহলরাজের কানে সে সংবাদ পৌঁছাল। তিনি কিছু না বুঝেই সেনা দলকে যুদ্ধে যেতে নির্দেশ দিলেন। শুরু হল রাজসৈন্যদের সঙ্গে দানো সেনার ঘোরতর যুদ্ধ। মাতৃকাগণও সেই যুদ্ধে অংশ নিলেন। রণক্ষেত্র ভয়াবহ রূপ নিল। চারিদিকে শুধু মৃতদেহের স্তুপ, নরমুণ্ডের গড়াগড়ি এবং রক্তের ধারায় যেন নদী বয়ে চলেছে। প্রেতেরা নরমাংসের বাজার নিয়ে বসেছে। সিংহলরাজ শালবাহন তখন পরাজিত ও ভীত হয়ে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর পরিচয় জানতে চাইলেন। চণ্ডী আত্মপরিচয় দিলেন। রাজা পরম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ভক্তিতে প্রণাম

করলেন দেবীর চরণে। দেবীর কৃপায় শালবাহন দেখতে পেলেন সেই অদ্ভুত কমলে-কামিনী দৃশ্যটি। সমর্পণ করতে চাইলেন কন্যা সুশীলাকে। দেবীর নির্দেশে হনুমান গন্ধমাদন পর্বত এনে দিলেন চণ্ডী ঔষধ প্রয়োগে মৃত সৈন্যদের পুনর্জীবিত করলেন। গণক ডেকে শ্রীমন্ত ও সুশীলার বিবাহের দিনক্ষণ গণনা শুরু হল। কিন্তু শ্রীমন্তের মন আনন্দহীন। সে আগে তার পিতার সন্ধান চায়। রাজার অনুমতিতে সমস্ত বন্দিশালা ঘুরে ঘুরে শ্রীমন্ত অসংখ্য বন্দি দর্শন করল। পিতাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে মনঃক্ষুন্ন হল। অবশেষে বন্দিশালায় দেখা মিলল ধূলি-ধূসরিত হৃতসৌন্দর্য এক বন্দির। অবশেষে জিজ্ঞাসাবাদে চিনতে পারল তার না দেখা পিতাকে। শ্রীমন্ত ধনপতির হাতে তুলে দিল তাঁর লেখা জয়পত্রটি। ধনপতি অতীত স্মৃতি স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন। এই বালকই তাঁর সন্তান। পিতা-পুত্রের আনন্দঘন মিলন হল। সিংহলরাজ সবকিছু দেখে নিজের দোষ স্বীকার করে নিলেন। রাজার বিরুদ্ধে ধনপতির ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হল। একদিন শুভক্ষণে শ্রীমন্ত ও সুশীলার বিবাহ সম্পন্ন হল। তারা সিংহলে ভোগ সুখে দিন কাটাতে লাগল। পদ্মা চণ্ডীকে পরামর্শ দিলেন শ্রীমন্ত ও ধনপতিকে যেন উজানিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দেবী রাতে শ্রীমন্তের শিয়রে দুখিনী খুল্লনার বেশে দেখা দিলেন। স্বপ্নে জননীকে দেখে শ্রীমন্তের সম্বিত ফিরে এলে স্বদেশে ফিরতে মন ব্যাকুল হল। ভবিষ্যৎ বিচ্ছেদ বেদনায় রাজপরিবারের সবাই বেদনা কাতর। সুশীলা বারোমাস্যার আকারে সুখের প্রলোভনের তালিকা তুলে ধরে স্বামীকে সিংহলে ধরে রাখতে চাইল। রাজা-রাণী সবাই অনুরোধ করলেন কিন্তু শ্রীমন্ত নিজ সিদ্ধান্তে অনড়। অগত্যা রাজা কন্যা ও জামাতাকে বিদায় দিলেন। বিদায়ের কালে রাজা ধনপতির কাছে পূর্বের অশালীন ব্যবহারের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করলেন। ধনপতি বললেন এ বিড়ম্বনার জন্য রাজা কিংবা অন্য কেউ দায়ী নয়, তাঁর কর্মদোষের কারণেই সে এই দুঃখ ভোগ করেছে। মহামায়ার পুজো না করার জন্য আজ তাঁর এই দুরবস্থা। আসার পথে মগরার কাছে দেবীর কৃপায় ধনপতি তাঁর পূর্বের ডুবে যাওয়া ছয় ডিঙা সহ সমস্ত সম্পত্তি ফিরে পেলেন। কয়েকদিন পর পুত্র ও পুত্রবধূসহ ধনপতি নিজের দেশে ফিরলেন।

ধনপতি ও শ্রীমন্তের প্রত্যাবর্তনের সংবাদে উজানিতে বণিক গৃহে আনন্দের আবহাওয়া। সংবাদ পেয়ে লহনা-খুল্লনা পুত্র ও পুত্রবধূ বরণ করতে এল। কিন্তু দেবীর অভিশাপের কারণে ধনপতি রোগগ্রস্ত থাকায় শারীরিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন বলে

লহনা-খুল্লনা প্রথম দর্শনে তাঁকে চিনতে পারলেন না। শ্রীমন্ত জননীকে জানায় যে, চণ্ডীর ক্রোধে পিতার এই রূপ। শ্রীমন্ত চলল রাজার সঙ্গে দেখা করতে উপযুক্ত উপঢৌকন নিয়ে। রাজা তার কাছে সিংহলের বিবরণ জানতে চাইলেন। শ্রীমন্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করল। এমনকি দেবী চণ্ডী মশানে তাকে কীভাবে রক্ষা করেছেন সেকথাও বলল। একথা শুনে রাজা বিক্রমকেশরীর সভাসদেরা অবিশ্বাস করে হাসাহাসি করলেন—

‘‘এতেক বচন জদি বলিল শ্রীপতি
খলখল হাসে তথা পাত্র দাশরথি।
রাম ওঝার পুত্র নাম দামুদর
উজানিতে পদবী আচার্য রত্নকর।
ডাক্যা বলে এই কথা কোথাহ না শুনি
মনুষ্যের তরে রণ করিলা ভবানী।
আছিল রাজার পাত্র নাম ফুটভাষি
শ্রীমন্তের বোলে তার উবজিল হাসি।
বিরিঞ্চি মরীচি প্রজাপতি পুরন্দর
ধ্যানে চরণ জার না পায় অন্তর।
সদা করি বুলে বেটা পাটনে পাটনে
ইহারে চণ্ডিকা দেখা দিল কোন গুণে।
হাসে জত লোক মুখে আরোপি বসন
শ্রীমন্তের বোলে না পাত্যায় কোনজন।
ফুটভাষী পাত্র বলে সুনহ গোসাঞি
বিদেশে চণ্ডীর কৃপা দেশে কেন নাঞি।
শ্রীমন্তে চণ্ডীর কৃপা দেখি সর্বজন
এথা জদি দেখি কুঞ্জে কামিনী-বারণ
নরপতি বলে সুন পাত্র দাশরথি
এই জদি সত্য তবে দিব জয়াবতী।
রাজা সাধু দুহেঁ কৈল প্রতিজ্ঞা-পূরণ

মসিপত্রে লিখন করিল সভাজন।''[৪৩]

রাজা তর্কসূত্রে প্রতিজ্ঞা করলেন, যদি কমলে-কামিনী মূর্তি শ্রীমন্ত দেখাতে পারে তাহলে তিনি তাঁর কন্যা জয়াবতীকে শ্রীমন্তের হস্তেই অর্পণ করবেন। কিন্তু শ্রীমন্ত তৎক্ষণাৎ কমলে-কামিনী মূর্তি দেখাতে পারল না। রাজা কোটালকে নির্দেশ দিলেন মিথ্যাবাদী শ্রীমন্তকে বলি দিতে হবে। শ্রীমন্ত আবার দেবী চণ্ডীর স্মরণ নিল। তখন মহামায়ার কৃপায় চারিদিকে মায়ানদের সৃষ্টি হল দেবীর চৌষট্টি যোগিনী রূপান্তরিত হলেন চৌষট্টি দল পদ্মে। দেবী নিজে কমলে-কামিনী মূর্তি ধারণ করে একটি হস্তীকে একবার গ্রাস ও পর-মুহূর্তে উদ্‌গীরণ করতে লাগলেন। দেবীর এই রূপ সভাসকল লোকের চিত্ত বিমোহিত করল। মায়া দৃশ্য নিশ্চিহ্ন হলে রাজা আনন্দে তাঁর প্রতিজ্ঞা মতো কন্যা জয়াবতীকে শ্রীমন্তের হাতে সমর্পণ করলেন। সুশীলা কিন্তু এ বিয়েকে প্রসন্ন মনে মেনে নিতে পারল না।

''কান্দে সিলা রাজার নন্দিনী
আকুল কুন্তলভার  না জানে পড়িল হার
স্বামীর গঞ্জিআ বলে বাণী।''[৪৪]

নববধূসহ গৃহে আগত শ্রীমন্তকে নানান প্রশ্নে, ক্রন্দনে, বিদ্রূপে বিদ্ধ করতে লাগল সুশীলা—

''তোমার জতেক ভাষ  কেবল বাগুরা-ফাঁস
ঘাটী আহিড়ীর জেন রিত
হাম মৃগী ক্ষীণবলা  না বুঝি তোমার ছলা
জত বৈলে সব বিপরীত।''[৪৫]

তার কাছে সপত্নী যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে ওঠে। তাই সে সিংহলে পিতার কাছে চলে যেতে চাইল—

''বলি প্রভু শুন কাম  অন্তরে নহীবে বাম
সাজন করিআ দেহ নায়।''[৪৬]

শ্রীমন্ত জানায় সে অসহায়, তার ইচ্ছানুসারে এ বিবাহ ঘটেনি। এবং শ্রীমন্ত আরো বলে, জ্যেষ্ঠা-পত্নীর সম্মান সর্বদায় আগে থাকে—

''রাজা করে কন্যাদান  আমি কি সাধিব মান
সতা নহে জয়া তব দাসী।

আনি ভৃঙ্গারের বারি পাখালে খুল্লনা নারী

প্রেমবতী বধূর বদন...''[৪৭]

বণিক খণ্ডের উপজীব্য বিষয় শৈব ধনপতির ধর্ম সঙ্কট মোচন। যিনি এতকাল অন্ধ দাম্ভিকতার জন্য শিব থেকে চণ্ডীকে পৃথক করে দেখেছিলেন। এবার ধ্যান নেত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁদের অভিন্নরূপ। মহাদেব অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে বণিকের সামনে আবির্ভূত হলেন। যে চণ্ডীকে এতদিন তিনি ঘৃণা করেছেন, অপমান করেছেন তিনি আসলে তাঁরই আরাধ্য দেবতার অর্ধাঙ্গিণী। বণিক এই ভ্রান্তির জন্য অনুতপ্ত হলেন। দেবী চণ্ডী এবার বণিক গৃহে প্রবেশ করলেন বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে। শ্রীমন্ত দেবীকে চিনতে পারল, দেবী এই বৃদ্ধা বেশে মশানে তাকে রক্ষা করেছিলেন। দেবীর চরণে সবাই প্রণাম করল। স্বামীর অহংকারের জন্য খুল্লনা দেবীর কাছে মাফ চাইলেন এবং রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করলেন। দেবীর বরে ধনপতি সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং প্রগাঢ় ভক্তিতে দেবীর চরণে প্রণাম করলেন। সবশেষে চণ্ডী কলিযুগের দোষ-গুণ বর্ণনা করে ধনপতিকে আশীর্বাদ করে বললেন—

''লহনার গর্ভে হব বংশের সঞ্চার
তাহা লয়্যা সুখে ঘর কর পুনর্বার।
জ্ঞান পায়্যা ধনপতি রহিল মন্দিরে
বায়ু বেগে রথযান চলিল পুষ্করে।''[৪৮]

এবার দেবীর নির্দেশে স্বর্গ থেকে নেমে এল পুষ্পরথ। মন্দাকিনীর স্বচ্ছ জলধারায় খুল্লনা, শ্রীমন্ত, সুশীলা ও জয়াবতী স্নান করে রথে চড়ে স্বর্গলোকে ফিরে গেল।

''মন্দাকিনী জলে স্নান কৈল চারি জনে
নিজ স্বর্গ পায়্যা সভে রহিলা নিজ স্থানে।।''[৪৯]

এইভাবে অপ্সরা রত্নমালা, ইন্দ্রপুত্র মালাধর ও তাঁর দুই পত্নী কর্তৃক দেবী চণ্ডীর পূজা ও মাহাত্ম্য প্রচারিত হল মর্ত্যলোকে।

**রামানন্দ যতি রচিত 'চণ্ডীমঙ্গলে'র কাহিনি :**

কোন সৃষ্টি কালোর্ত্তীণ ও যুগোর্ত্তীণ হয় তার গুণবৈশিষ্ট্যে। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সুবিস্তীর্ণ মঙ্গলকাব্যের জগতে এমনই এক স্বল্পজ্ঞাত সৃষ্টি রামানন্দ যতির 'চণ্ডীমঙ্গল'।

এশিয়াটিক সোসাইটির পুথিতে অবশ্য কবির নাম রামানন্দ গোস্বামী এবং কাব্যের নাম ‘চণ্ডীর গীত’ বলে উল্লিখিত হয়েছে। গ্রাম্যতাদোষ ও স্থূলরুচী বর্জিত এই কাব্য কাহিনি মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে কবিকে এক ভিন্ন পরিচিতি দান করেছে।

চণ্ডীমঙ্গলকার রামানন্দ যতির ‘চণ্ডীমঙ্গল’ এর কাহিনি বিন্যাসের ধরণটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ভূমিকা স্বরূপ এই কথাগুলি বলার তাৎপর্য এই যে, রামানন্দ একজন প্রতিভাধর কবি হওয়ায় সমকালীন যুগের বহুচর্চিত ভাব ও প্রথাসিদ্ধ আঙ্গিক মেনে নিয়ে শুধুমাত্র মুকুন্দের কাব্যের দোষগুলিকে তুলে ধরার জন্য এবং ভক্তিশাস্ত্র থেকে স্থূলরুচিকে বর্জন করার উদ্দেশ্যেই ‘চণ্ডীমঙ্গলকাব্য’ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তবে কাহিনির ক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের কাছে ঋণী থেকেও নতুনত্ব দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন, তেমনি রূপবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে প্রথানুগত্য স্বীকার করেও দেখিয়েছিলেন আত্মস্বাতন্ত্র্য।

গঠনের বিচারে কাব্যের মূল কাহিনি তিনটি। যথা—

ক. শিব-গৌরী আখ্যান

খ. কালকেতু আখ্যান

গ. ধনপতি আখ্যান

প্রত্যেকটি কাহিনি পূর্ণাঙ্গ ও স্বতন্ত্র। রামানন্দ যতির ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যটি মঙ্গলকাব্যের প্রথাবদ্ধ রীতি মেনেই রচিত। কবি কাব্যের অভ্যন্তরে কাহিনির কিঞ্চিত পরিবর্তন করেছেন। কাহিনিটিকে এইভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে—

**ক. বন্দনা :** গণেশ বন্দনা, লক্ষ্মী বন্দনা, গৌরাঙ্গের বন্দনা, শক্তি দেবীর পঞ্চরূপের বন্দনা, নারায়ণ বন্দনা, দিক্করবাসিনী, কামাখ্যা, মঙ্গল ভবানী ইত্যাদি সতীপীঠ -এর দেবীদের বন্দনা, জগন্নাথ - বন্দনা, নরসিংহ হরি বন্দনা ইত্যাদি।

**খ. গ্রন্থোৎপত্তির কারণ :** কবি কেন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য লিখেছেন সে কথার উল্লেখ রয়েছে। কবি আত্মপরিচয় জ্ঞাপক কোন শ্লোকের উল্লেখ করেননি।

**গ. দেবখণ্ড :** সৃষ্টিপালা অংশে আদি দেব-দেবী, জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কিত কাহিনি। শিব কাহিনি অংশে ভৃগু মুনির যজ্ঞ, দক্ষের শিব নিন্দা, সতীদক্ষালয়ে গমন, সতীর নিবেদন, দক্ষের শিবনিন্দা, সতীর দেহত্যাগ, দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গ, গৌরীর জন্ম, হর-গৌরীর বিবাহ, গৌরীর পূজা, শিবের উপদেশ, ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে মহাদেবের অভিশাপ ইত্যাদি।

**ঘ. নরখণ্ড :**

**(i) কালকেতু কাহিনি :** কালকেতুর জন্ম, দেবীর গোধিকা রূপ ধারণ, ফুল্লরার খেদ, কালকেতু-ফুল্লরার কথোপকথন ভগবতীর নিজ মূর্তি ধারণ, ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ, কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি, গুজরাটনগর নির্মাণ, কালকেতুর ভাঁড়ু দত্তের আগমন, কালকেতুকে ছলনা, কলিঙ্গরাজের সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধ, ভাঁড়ুর ছলনা, কলিঙ্গরাজকে দেবীর নির্দেশ, কালকেতুর রাজ্য প্রাপ্তি, কালকেতুর স্বর্গে গমন।

**(ii) বণিক খণ্ড :** রত্নমালার শাপপ্রাপ্তি, খুল্লনার জন্ম, খুল্লনার বিবাহ, ধনপতির বাণিজ্য যাত্রা, খুল্লনার নির্যাতন, ছাগল চড়ানো, ধনপতির প্রত্যাবর্তন, খুলনার উৎসব, খুল্লনার পরীক্ষা, ধনপতির, সিংহল যাত্রা, পথের অভিজ্ঞতা, কমলে-কামিনী দৃশ্য, ধনপতির নিগ্রহ, শ্রীপতির জন্ম, শ্রীপতির বাল্যকাল, শ্রীপতির সিংহল যাত্রা, কমলে-কামিনী দৃশ্য, শ্রীপতি পরিত্রাণে দেবীর উদ্যোগ, সিংহলের রাজার নতিস্বীকার, ধনপতির উদ্ধার, পিতাপুত্রের মিলন, দেশে প্রত্যাবর্তন, দেবীর আনুকূল্য, শ্রীপতির দ্বিতীয় বিবাহ, প্রথমা পত্নির দুঃখ, খুল্লনা ও শ্রীপতির শাপমোচন ইত্যাদি।

**ক বন্দনাংশ :** কবি রামানন্দ কাব্যের বন্দনাংশে দেব-দেবীর স্তুতিতে পুরাণ ও তন্ত্রের ধারাকেই বহন করেছেন। স্তোত্র রচনায় রীতিগত দিক থেকে অভিনবত্ব দেখানো সম্ভব না হলেও তিনি একসঙ্গে অনেক দেব-দেবীদের বন্দনা করেছেন। চণ্ডীর স্তোত্রের মধ্যদিয়ে কাব্যের সূচনা হলেও শুরুতেই রয়েছে 'গজানন' অর্থাৎ গণেশ বন্দনা। কাব্যে রয়েছে—

''গজানন রূপ ধরি ব্রহ্মময় অবতরি
চতুর্ভুজ বিঘ্নবিনাশন
প্রভাত অবুতভানু নিন্দিয়া সুন্দরতনু
কোটি চন্দ্র প্রকাশবদন।।''[৫০]

এরপর রয়েছে সরস্বতী বন্দনা। কবি সংহিতা, পুরাণ মতে দেবীকে স্মরণ করেছেন ও শ্বেত সুভ্র রূপের বর্ণনা করেছেন—

''শ্বেত কমলের পরে বীণা ও পুস্তক করে
কবু বিদ্যা অক্ষসূত্র ধরি।

কবু হও লক্ষ্মীময়ী বরাভয় করে জয়ী

কবু হও ব্রহ্ম হরহরি।।

ব্যাস আমি কবিবরে তোমার স্মরণ করে

সংহিতা পুরাণ করে তারা।

অন্য যেবা করে আশা মুখেতে ছাপান্ন ভাষা

নিরন্তর কবিতার ধারা।।''[৫১]

রয়েছে ভাগীরথী বন্দনা—

''বন্দো ভাগীরথী মাতা ত্রিজগতে সার।

ভরসা কর্যাছি তুয়া নামে হর পার।।

ত্রিপথগা হইলা ত্রিলোক উদ্ধারিণী।

মা অধমে কর পার ত্রিলোক তারিণী।''[৫২]

কবির জীবনের সমস্ত তাপ দুঃখ তিনি ভাগীরথীতে বিসর্জন দিতে চেয়েছেন। সগর বংশ উদ্ধারের হেতু ভাগীরথীর মর্তে আগমন—

''সগর বংশ উদ্ধারিলা নাম ভাগীরথী।

তরাইতে হল্যো তোর সুতহীন গতি।''[৫৩]

পরবর্তীকালে এসেছে চৈতন্য বন্দনা। চৈতন্যদেব কবি বর্ণনায় প্রেমনাম প্রচারের প্রধান মাধ্যম—

''কীর্তন রসের ছলে গোরা অবতার।

হরি নাম কলিযুগে প্রকাশিলা সার।।

দেখিয়া জীবের দুঃখ কাতর হৃদয়।

প্রেম রসে মগ্ন হৈলা প্রভু দয়াময়।।''[৫৪]

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমনাম প্রচারের উদ্দেশ্যেই চৈতন্যদেব মর্তে জন্মগ্রহণ করেন—

''ধরিলা চৈতন্য নাম বিলাও চেতনা।

নিজ নাম জপ সদা ভাবহ আপনা।।

বুঝিলা কলিতে জপ তপ নাহি আর।

জগত উদ্ধার নাম করিলা প্রচার।।''[৫৫]

এরপর দেবীর পঞ্চবিধ শক্তির বন্দনা করেছেন কবি—

''বন্দো পঞ্চবিধা শক্তি দেও মা অভেদ ভক্তি
সতী রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী।
সাবিত্রী বেদের মাতা এই পঞ্চ কন ধাতা
সব পদে মোর লক্ষ নতি।।''[৫৬]

পরবর্তীকালে সতীর মহিমা পাঠের বর্ণনা এবং সতী পীঠের দেবীদের বন্দনা করেছেন—

''পূর্ব্বদিকে বন্দো দেবী দিক্করবাসিনী।
হয়গ্রীব মাধব যে কামাখ্যা রূপিনী।।
জঙঘাপীঠ বন্দিব টোপরেশ্বরী নাম।
জলেশ্বর দুগ্ধ নাথ যোগী গুথধাম।।
শ্বেত পর্ব্বতেতে বন্দো অনাদি গণেশ।
বন্দিব ত্রিপুরেশ্বরী ত্রিপুরার দেশ।।''[৫৭]

কবি জগন্নাথ দেবের বন্দনা করেছেন এবং পুরীর মন্দিরের বিস্তারির বর্ণনা দিয়েছেন—

''জগন্নাথ প্রভুবন্দো নীলাচলপুর।।''[৫৮]

**খ. গ্রন্থোৎপত্তির কারণ :**

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ উল্লেখ করা এক আবশ্যিক প্রথা। এই অংশেই সাধারণত কবিরা নিজেদের ব্যক্তিগত পরিচয় ও কেন তিনি গ্রন্থটি রচনা করছেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে দেবাদেশের উপাখ্যানকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার আগ্রহে প্রায় সমস্ত কবির তৎকালিন পরিবেষ্টনকে যথাসাধ্য বাস্তব করে উপস্থাপনে ঐকান্তিক। রামানন্দ যতি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের যাত্রী। তিনি স্পষ্টরূপেই জানিয়ে দিয়েছেন মুকুন্দের কাব্যের সমালোচনা করার জন্য অর্থাৎ মুকুন্দের কাব্যের ভুলগুলোকে চিহ্নিত করে সুধরে দেবার জন্যই তিনি এই ভক্তি শাস্ত্রটি রচনা করেছেন। শুধু তাই নয় মুকুন্দ কাব্যে যে আদিরসের বর্ণনা করেছেন তাও নিন্দনীয়। এই দোষ উদ্ধারের হেতু জনসাধারণের চৈতন্য ফিরিয়ে আনতে তিনি 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যটি রচনা করেছিলেন—

‘‘চণ্ডী যদি দেন দেখা তবে কি তা জায় লেখা
পাঁচালীর অমনি রচন।
বুদ্ধি নাই জার ঘটে তারা বলে সত্য বটে
পথে চণ্ডী দিলা দরশন।।
এত দোষ উদ্ধারিতে লোকের চৈতন্য দিতে
চণ্ডী রচে রামানন্দ যতি।
অনেকের অনুরোধ কেহ না করিহ ক্রোধ
অনেক শিষ্টের অনুমতি।।’’[৫৯]

মুকুন্দের স্বপ্নে চণ্ডী দরশনকে কবি রামানন্দ মিথ্যা বলে মনে করেন। কারণ দেবী চণ্ডী যদি কবি মুকুন্দকে দেখা দিতেন তবে তিনি কখনোই তা এভাবে কাব্যে লিখে যেতে পারতেন না।

**গ. দেবখণ্ড :**

মঙ্গলকাব্যের প্রথাবদ্ধ রীতিকে মেনেই রামানন্দ দেবখণ্ডের কাহিনি নির্মাণ করেছেন। দেব-দেবীদের আচার-আচরণের মধ্যে মর্ত্য জীবনের ছবি ফুটে উঠলেও কখনো তা গ্রাম্য রুচির পরিচয় হয়ে ওঠেনি। দেব- দেবীদের পরিকল্পনায় কবি উচ্চ আদর্শের পরিচয় দিয়েছেন। দেবখণ্ডের আরম্ভ হয়েছে ‘সৃষ্টি’ বর্ণনার মধ্যদিয়ে। নিরাকার প্রকৃতি ও পুরুষের সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টি হল মনুর। মনু আবার স্বর্গ ও মর্ত্য ধামের নির্মাণ করলেন। শতরূপার সঙ্গে মনুর বিবাহ হল। তাদের পুত্রের নাম প্রিয়ব্রত এবং কন্যা — আকুতি, প্রসূতি ও দেবহুতি। আকুতির স্বামীর নাম রুচি, দক্ষের জায়া প্রসূতি এবং কর্দম -এর স্ত্রী হলেন দেবহুতি। দক্ষ ও প্রসূতির কন্যা হলেন সতী। নারদের পরামর্শে শিবের সঙ্গে সতীর বিবাহ হয়। এই কাহিনি কবি পুরাণ থেকে সংগ্রহ করেছেন। ভৃগুমুনি এক যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞে শিব ব্যাতীত দক্ষ প্রজাপতিকে সকলেই প্রণাম করেন। এতে দক্ষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন—

‘‘বাপা শিব আমার জামাতা।
বাপার গৌরব বড় কূলে শীলে অতি দড়
লাজ করে নামাইতে মাথা।
নারদেরে কি বলিব ঘটকালী কিবা দিব

এই ছিল সতীর কপালে।

বাপা মঙ্গলের ধাম তেঞি কৈল শিব নাম

শোভা পায়্যাছেন হাড়মালে।

নাহি জানি আদ্য মূল কোন জাতি কোন কূল

নাহি জানি কেবা পিতামাতা।''[৬০]

দক্ষ এক যজ্ঞের আয়োজন করলেন এবং সেখানে সব দেবতাদের নিমন্ত্রণ করলেও শিবকে কিন্তু নিমন্ত্রণ পাঠালেন না। স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও সতী পিতৃগৃহে রওনা হলেন। অগত্যা শিব অনুচরদের পাঠালেন দেবীর সঙ্গে। প্রসূতি কন্যাকে দেখে খুশি হলেন—

''সতীকে দেখিয়া মার চক্ষে বহে নীর।

চুমা খায়্যা কোলে লৈয়া প্রাণ হৈল স্থির।।''[৬১]

কন্যাকে পেয়ে জামাতার নিন্দা করায় সতী রুষ্ট হন—

''অভিমানে সতী নাহি কহেন বচন।

শিবনিন্দা শুনিয়া আকুল আরো মন।।''[৬২]

সতী শিব নিন্দা থেকে মাতাকে বিরত থাকতে বলেন। কিন্তু দক্ষের কাছে শিব নিন্দা শুনে সতী প্রাণত্যাগ করেন—

''অভিমান কর্য়া সতী ত্যজিলা শরীর।

নাম সতী কর্ম সতী পতি মতি স্থির।।''[৬৩]

কন্যাকে হারিয়ে দক্ষ শোক প্রকাশ করেছেন। পরবর্তীকালে দক্ষযজ্ঞ নাশের কালে বীরভদ্রের জন্ম এবং দক্ষযজ্ঞ বিনাশের যে চিত্র রামানন্দ অঙ্কন করেছেন তাতে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে—

''দেখ্যা দ্বিজগুণ সব করে হায় হায়।

পৈতা দেখাইয়্যা সবে পলাইয়া যায়।।

কেহ বলে আমার নৈবেদ্য নিলে কেবা।

কেহ বলে আমার সন্দেশগুলি দেবা।।''[৬৪]

প্রসূতি জামাতার কাছে শ্বশুরের প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন—

''প্রসূতি কান্দিয়া কল্যা শিবেরে দেখিয়া।

সৃষ্টিরক্ষা কর শিব প্রাণ দান দিয়া।।

মূরমতি দক্ষ যদি করিয়াছে পাপ।
কিরূপে সহিবা বাপু শ্বাশুড়ীর তাপ।।''[৬৫]

কাহিনির পরবর্তীকালে সতীর একান্ন পীঠের বর্ণনা রয়েছে। কাহিনির দ্বিতীয় ভাগে হিমালয় ও মেনকার গৃহে সতী-গৌরী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। গৌরীকে কন্যা রূপে পেয়ে হিমালয় ও মাতা মেনকা আনন্দিত। কাব্যের এ অংশে বাৎসল্য রসের আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়। নারীদের তত্ত্বাবধানে গৌরীর সঙ্গে মহাদেবের বিবাহের আয়োজন চলে। বিবাহ বাসরে জামাতার রূপ দেখে মাতা মেনকা আতঙ্কিত। পিতা হিমালয়কে তিনি ভর্ৎসনা করেছেন—

''বর দেখ্যা রাণী কিছু বিরহ অন্তর।।
নারদ বল্যাছে বর করিবে কুবেশ।
সকলেরে রাণী তাই বুঝান বিশেষ।।
তথাপি কন্যার স্নেহে বিরস বদন।
গৌরার এমন বর বিধাতা কেমন।''[৬৬]

শিব অবশ্য 'মদনমোহন' রূপ ধারণ করে বেদনাটুকু মুছে ফেলেছেন। এরপর শিব-গৌরীর ঘরজামাই থাকা এবং মায়ের সঙ্গে উমার কলহ ইত্যাদি চিত্রগুলি কবি পূর্বসূরিদের অনুসরণ করে রচনা করেছেন।

উমাও মায়ের সঙ্গে কলহরত। সাধারণ কন্যার মতোই তিনি স্বামীর নিন্দা শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠেন এবং দুই সন্তান এবং স্বামীকে নিয়ে পিতৃগৃহ ত্যাগ করেন। পরবর্তী কাহিনিতে মুকুন্দ যেখানে গৌরীর সংসারের অভাবের চিত্র অঙ্কন করেছেন রামানন্দ, সেখানে কাহিনির কিঞ্চিত পরিবর্তন করেছেন। রামানন্দের মতে যিনি নিজেই অন্নপূর্ণা তাঁর ঘরে অন্নের অভাব কি করে ঘটতে পারে। তাই—

''কন্দল করিয়া গৌরী গেলা মহীপরে।
অন্নবিনা হৈয়া ক্ষীণা এ কথা কি ধরে।।
যতি বলে দুষ্টকথা আমি না লিখিব।
না বুঝিলে তাহারে কিরূপ বুঝাইব।।''[৬৭]

তাই উপযুক্ত ভোজন করে, সিদ্ধি খেয়ে শিব গৌরীকে ডাকেন এবং বলেন—

''সিদ্ধি খায়্যা কন হর গৌরী মোরে দেও বর

পৃথিবী রাখিতে কর মন।

ভাঙ্গেতে ভুলিয়া থাকি কবে জানি মুদি আঁখি

না জানি কি হয় বা কখন।।

শুভচণ্ডী নাম ধর মনুষ্যের হিত কর

বারিতে কর গা অধিষ্ঠান।।''[৬৮]

অকস্মাত পিছনে ফিরে দেখেন নীলাম্বর বাঘের মত চুপ করে হাতে পূজার ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মহাদেব তাঁকে ব্যাধ কালকেতু রূপে মর্ত্যে নিয়ে পূজা প্রচারের নির্দেশ দিলেন।

এই সংবাদে ইন্দ্র ও তার স্ত্রীর পুত্রের জন্য শোক প্রকাশের বর্ণনা রামানন্দের কাব্যে রয়েছে।

**ঘ. নরখণ্ড :**

**(১) ব্যাধ খণ্ড বা আক্ষটি খণ্ড :**

রামানন্দের আক্ষটি খণ্ডটি অতি সংক্ষেপে নির্মিত। দেবতনু ত্যাগ করে নীলাম্বর কালকেতু রূপে মর্ত্যে ব্যাধ ধর্মকেতুর ঘরে জন্মগ্রহণ করলেন। কালকেতু প্রভুত পরাক্রমশালী বীর। ধর্মকেতু সারাদিন যা নিয়ে আসে কালকেতু একাই সব খেয়ে ফেলে। কালকেতু চরিত্রকে নবরূপে নির্মাণ করেছেন রামানন্দ—

''বেচ্যা খাত্যে আনে বুড়া যত জন্তু ধর‍্যা।

পোড়াইয়া খান কালু সব চুরি কর‍্যা।।

আলু কচু ওল বনফল যত আনে।

জল খাই বল্যা কালু পূরেন বয়ানে।।

বেচ্যা খাওয়া হোথা যাউক মাতা পিতা

কালুর কল্যাণে নিত্য উপবাস করে।''[৬৯]

তবে মৃগয়াতে কালকেতু দক্ষ—

''বাঘের উঠায় দন্ত চর্ম্ম চক্ষু নখ।

হরিণ ধরিয়া প্রাণ করে শক মক।।

এইরূপে কালুর হইল বীর নাম।

কলিঙ্গেতে বিন্ধ্যবনে বসতির ধাম।।''[৭০]

ফুল্লরা সঙ্গে কালকেতুর বিবাহ হয়। কিছুকাল পরে ধর্ম্মকেতু ও তার স্ত্রী স্বর্গে যাত্রা করে। পিতা মাতার মৃত্যুতে কালকেতু ও ফুল্লরা শোকাহত। কালকেতুর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বনের পশুরা দেবীর স্মরণাগত হয়। এই অংশে মুকুন্দের কাব্যের মতো পশুগণের গোহারি অংশটি অনুপস্থিত। পশুদের ডাকে সাড়া দিয়ে দেবী গোধিকা রূপ ধরে বনে পড়ে থাকেন। কালকেতু সেই গোধিকাকে বাড়িতে নিয়ে আসে—

''বনে কালকেতু ফিরে পশু হেতু
গোধিকা ধরে অমনী।।
করিয়া রন্ধন রাখিল ভবন
গোলাহাটে যায় বীর।
কালুর দুর্গতি দেখ্যা ভগবতী
প্রাণ হইল অস্থির।।''[৭১]

দেবী জালপাশ ছিন্ন করে নিজ মূর্তি ধারণ করলেন। কবি রামানন্দ এখানে দেবীর বিচিত্র রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। তবে এই বর্ণনায় মুকুন্দের মতো গ্রাম্যতা বা চটুলতা প্রকাশ পায়নি বরং তা দেবীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শিত হয়েছে।

ফুল্লরাকে রন্ধন করতে বলে বীর হাটে চলে যায়। ফুল্লরা অন্যের গৃহ থেকে চাল ধার করে নিয়ে এসে দেখে তার কুড়ে ঘর আলো করে এক সুন্দরী রমণী বসে রয়েছে—

''কুড়্যার দুয়ারে আস্যা দেখেন সুন্দরী।।
ভয়েতে হিংসাতে রামা কাঁপে থর থরা।
দূরে গেল ক্ষুধা গেল রন্ধনের ত্বরা।।''[৭২]

ফুল্লরা দেবীর কাছে পরিচয় জানতে চাওয়ায় দেবী ছলনার মাধ্যমে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। দেবী ফুল্লরার ঘরে থাকার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন—

''আগে লব মোর হাতে থাকিবেক শরা।
মোর বশ হবে বীর ঘুচাব পসরা।।
শুন্যা ফুল্লরার মুণ্ডে পড়ে যেন বাজ।
কাদ্যা বলে তোমায় থাকিয়া নাই কাজ।।''[৭৩]

ফুল্লরা নিজের বারো মাসের দুঃখের কাহিনি দেবীকে শোনায়—

‘‘দুঃখের নাহিক সীমা কি কহিব আন।
আমানি খাবার গর্ত দেহ বিদ্যমান।।
পাপ জ্যৈষ্ঠ মাস অল পাপ জ্যৈষ্ঠ মাস।
ঝড়ে উড়াইয়্যা নিয়া ফেলে কুঁড়্যাবাস।।’’[৭৪]

এভাবে আষাঢ়, শ্রাবণ সহ মোট বারো মাসের দুঃখ বর্ণনা করেছে ফুল্লরা। কিন্তু চণ্ডী নিজ সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন। ছলনার মাধ্যমে নিজের বংশ পরিচয় দিলেন। দেবীর আত্মপরিচয়ের এই অংশে কবি ভারতচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই অংশে কবি রামানন্দ দুর্গার বিবিধ রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। অবশেষে কাঁদতে কাঁদতে ফুল্লরা হাটে যায় ও কালকেতুকে দোষারোপ করে—

‘‘ফুল্লরা বলিল শুন কিরাতের পো।
মাংস বেচা এখন হোথায় নিয়া থো।’’[৭৫]

ফুল্লরার কথাতে কালকেতু ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সমস্ত বর্ণনা শুনে বীর বুঝতে পারে মা চণ্ডী তার গৃহে এসেছেন—

‘‘কাঁদ্যা কন রামা তুই কিবা পুণ্যবতী।
আমি কি পাইব দেখ্যা মায়ের মূরতি।।’’[৭৬]

কালু গৃহে গিয়ে দেবীর পরিচয় জানতে চায়—

‘‘আমি ব্যাধ নীচ অতি তুমি মাগ কুলবতী
পরিচয় চাহে কালকেতু।’’[৭৭]

কালকেতু দেবীকে বলে সে নীচু জাত তাদের গৃহে আসলে সকলে স্নান করে। তাই দেবী যেন সেখান থেকে চলে যান—

‘‘কিরাত হিংসক রাড় মাংস চর্ম নাড়ী হাড়
শ্মশান সমান এই স্থান।
হতভাগ্য পাপমতি দুরাচার আমি অতি
এ ঠাঞি আইলে করে স্নান।।’’[৭৮]

দেবী নিজ মূর্তিতে আবির্ভূত হলে কালকেতু ব্যাধ জীবন থেকে মুক্তি চায়। মাতা বলেন তার

পূজা করলে খুব শিঘ্রই কালকেতুর মুক্তি ঘটবে—

''কর্য্যো তুমি আপনার জাত্যের আচার।
জপ পূজা কর্য্যো তুষ্টি হইবে আমার।।
জাতি কূল আমরা বিচার নাহি করি।
আচার না লই কিন্তু ভক্তি মাত্র ধরি।।''[৭৯]

দেবী কালকেতুকে সাত ঘড়া ধন দিলেন এবং গুজরাট নগর নির্মাণ করতে নির্দেশ দিলেন। দেবী ফুল্লরার হাতে টাকা দিলে ফুল্লরা তা চিনতে পারে না—

''হাস্যা বলে মা ইহাতে আছে আঁকা বাকা।
চাকলিয়া পারা গুলো একে বলে টাকা।।
কালু কন মা আর থাকিব কত কাল।
ধনী দিয়া মা আর না বাড়াসি জঞ্জাল।।''[৮০]

সেই ধন ভাঙাতে কালু বাঞ্ছারাম নামে এক বণিকের ঘরে যায়। কাহিনির এই অংশটি হাস্য রসাত্মক। পোদ্দার ভাবে কালু মাংসের ধারের টাকা নিতে এসেছে তাই লুকিয়ে পরে, কিন্তু পরে ধনের অভাস পেয়ে বাইরে আসে। মোহরগুলি দেখে কালকেতুকে বলে—

''কোন দেশে ভাইপো করিয়াছ কামাই।
বেটি হৈলে বেটা মোরে করিস জামাই।।''[৮১]

অবশেষে দেবীর নির্দেশে বণিক কালকেতুকে মোহরের সঠিক মূল্য দিয়েছে।

কবিকঙ্কণের কাহিনির মতো কেনা অঙ্গুরীর উল্লেখ রামানন্দ করেননি। কালকেতু গুজরাট নগর নির্মাণের পর সেখানে বিভিন্ন পেশার লোকেরা এসে বসতি নির্মাণ করে। কলিঙ্গরাজ কেশরী সিংহ রায়ের কাছে কালকেতুর রাজ্য নির্মাণের খবর গেলে রাজা ক্ষিপ্ত হন—

''কাটাইলা বিন্ধ্যবন না করিয়া নিবেদন
কোথায় রাখিলা বনহাতি।''[৮২]

কিন্তু কালকেতু রাজার কাছে সে কৈফিয়ত দিতে নারাজ। রাজা ভাণ্ডুদত্তকে নির্দেশ দিলেন সে যেন তিনশো সৈন্য নিয়ে কালকেতুর রাজ্যে গিয়ে কালকেতুকে বন্দী করে নিয়ে আসে। ভাণ্ডু বলে—

‘‘ভাণ্ডু দত্ত কয় শুন মহাশয়

আমরা লোক রাজার।

দেখিয়া স্বপন মহীপতি কন

পাতক হৈল আমার।।’’[৮৩]

এভাবে কালকেতুকে ভুলিয়ে বন্দী করে রাজার কাছে নিয়ে জায় ভাণ্ডু। কার আজ্ঞায় কালু বন কেটে রাজ্য নির্মাণ করেছে একথা রাজা জানতে চাইলেন। কালকেতু জানায় দেবী চণ্ডীর আজ্ঞায় সে একাজ করেছে কিন্তু রাজা তার কথায় বিশ্বাস করলেন না। কালু কারাগারে অনাহারে ফুল্লরাকে স্মরণ করেছে। এসবের জন্য দেবী চণ্ডীকে দোষারোপ করেছে ফুল্লরা—

‘‘মাংস বেচ্যা খাইতাম তাহে মা হইলা বাম

কেনে মা আমাকে দিলা ধন

পুত্র বল্যা ডাক্যাছিলা আজ মা কি পাসরিলা

জল বিনা যায় মা জীবন।’’[৮৪]

অবশেষে দেবীর আজ্ঞায় কলিঙ্গ রাজ্য ঝড়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। রাণী রাজার কাছে দেবীর স্বপ্নাদেশের কথা জানান। রাজ্যের পুরোহিতরাও রাজাকে বলেন কালকেতুকে যেন মুক্ত করে দেওয়া হয়। রাজা কেশরী সিং কালকেতুকে মুক্ত করে তার মাথায় ছাতা ধরেন। কালকেতুকে যথাযোগ্য সম্মান জানান—

‘‘রাজা হৈয়া কালকেতু করেন কৌতুক।

ফুল্লরা লইয়া কত করিছেন সুখ।।’’[৮৫]

এইরূপে দেবীর পূজা প্রচারিত হলে স্বর্গ থেকে রথ এসে কালকেতু ও ফুল্লরা তথা নীলাম্বর ও ছায়াকে স্বর্গে নিয়ে যায়।

**২০. বণিক খণ্ড :**

হর-গৌরী কৈলাসে অধিষ্ঠিত। স্বর্গের অপ্সরা রত্নমালা দেবতাদের মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্য প্রদর্শন করেছিলেন। এমনসময় তার তালভঙ্গ হলে ক্রুদ্ধ হয়ে দেবী তাকে অভিশাপ দেন—

‘‘চণ্ডী কন রূপবতি কি দেখ্যা চঞ্চলমতি

রূপের গৌরবে অহঙ্কার।।

যাও তুমি মহীপর পারে পতি মনোহর

পায়্যা পুন হইবে বিচ্ছেদ।''[৮৬]

ইছানী নগরে লক্ষ্মীপতির ঘরে খুল্লনা রূপে জন্মগ্রহণ করলেন।

উজানী নগরে ধনপতি সদাগরের সঙ্গে তার বিবাহ হয় লহনার। তাদের কোন সন্তান ছিল না। লক্ষ্মীপতি ঠিক করেন খুল্লনার সঙ্গে ধনপতির বিবাহ দিবেন। লহনার ভয়ে ধনপতি গোপনে খুল্লনাকে বিবাহ করেন। লহনা প্রথমে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও কিছু দ্রব্য পেয়ে মনকে স্থির করেন। খুল্লনা তার সম্পর্কে খুড়ার মেয়ে। খুল্লনাকে পেয়ে প্রথমে লহনা সন্তানের মতোই স্নেহ করেন—

''লহনা সুমতি স্নেহ করে অতি

কন্যা যেন আল্যো ঘরে।।

খুড়ার দুহিতা পায়্যা হরষিতা

ঘরে নাহিক সন্তান।

তারি করে কোলে সেও দিদি বোলে

সদা করয়ে সম্মান।।''[৮৭]

বিবাহের পরে নানা উপঢৌকন নিয়ে রাজা বিক্রমকেশরীর কাছে গেলেন ধনপতি। ধনপতি রাজার কাছে বাণিজ্য যাত্রার জন্য অনুমতি চাইলেন রাজা তাকে অনুমতি দিলেন। নৌকা সাজিয়ে সদাগর শুভদিনে বাণিজ্য যাত্রায় বেরোলেন।

অন্যদিকে খুল্লনাকে লহনা কন্যার মত আগলে রেখেছেন। তাকে মায়ের মত সেবা করছেন। কিন্তু 'দুশ্শীলা' দুর্বলা দাসী সদাই তাদের কুমন্ত্রণা দিতে ব্যস্ত—

''এখন খুলনা আছে বয়সে ছাওয়াল।

বড় হইলে তোমার হইবে তাই কাল।।

শেষ পক্ষে সকলেরি হয় অতি মায়া।

বন্ধ্যা তুমি বুড়া হৈলা নামমাত্র জায়া।।''[৮৮]

অবশেষে কুমন্ত্রনায় কাজ না হলে গ্রামের এক ব্রাহ্মণীকে দিয়ে দুর্বলা উভয়ের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করতে চায়—

''গ্রামেতে আছিল এক ব্রাহ্মণের নারী।
ছেদভেদ অনেক জানয়ে জাদুগারী।।
তাকে দিয়া দুজনার জন্মাইল ভেদ।
যতি বলে জঘন্য রসেতে পাই খেদ।।''[৮৯]

লহনা ধনপতির নাম করে একটি জাল পত্র লেখায় সে পত্রে লহনার সমস্ত গহনা কেড়ে নিয়ে ছাগল চড়ানোর কথা বলা হয়েছে। শুরু হল খুল্লনার ওপর নির্যাতন—

''কাড়িয়া লইল খুলনার অলঙ্কার।
দেখ্যা দাম দাসীগণ করে হাহাকার।।''[৯০]

খুল্লনার বস্ত্র পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়। অনাহারে রাখা থেকে শুরু করে নানাপ্রকার যন্ত্রণা সবই প্রয়োগ করা হল। একদিন তার একটি ছাগল হারিয়ে যায়। লোকে খুল্লনার পিতা-মাতার কাছে তার দুর্দশার কথা বলে। খুল্লনার মাতা কন্যাকে আনতে লোক পাঠান। খুলনা বলেন রাত্রে গেলে লোকে নিন্দা করতে পারে। লহনা সাধুর ভয় দেখিয়ে খুল্লনার বাপের বাড়ি যাওয়া আটকায়—

''সাধু না আইলে ঘরে কে এত সাহস ধরে
বিদায় করিবে পরিজন।।''[৯১]

উজানি নগরের লোকেরা খুলনার পিতা-মাতার কাছে গিয়ে তার দুঃখ বর্ণনা করেছে।

খুল্লনা ছাগল হারিয়ে বনের মধ্যে খুঁজতে লাগলেন এবং দেখতে পেলেন নারীরা মঙ্গ লচণ্ডীর পূজা করছে। খুল্লনাও দেবীর পুজো করলেন। এদিকে দেবীর কৃপায় লহনার সুমতি হয়েছে। রাতে বাড়ি না ফেরায় সবাই চিন্তিত। লহনা নিজের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত।

অন্যদিকে দেবী গৌড়ে গিয়ে ধনপতিকে ছল করে দেখা দিলেন এবং বাড়ি ফেরার কথা বলেন। ধনপতি বাড়ি ফিরে সমস্ত ঘটনা জানতে পেরে লহনাকে ত্যাগ করতে চাইলেন। লহনা জানায় এসবের জন্য দাসী দুর্বলা দায়ী—

''শুন্যা সাধু লহনাকে ত্যাজিবার চায়।
তখন আইল পথে না দেখ্যা উপায়।।
দুষ্টা বলে লওয়াইল দুবলা কুমতি।
শুন্যা দুবলাকে দূর করে ধনপতি।।''[৯২]

ধনপতি জ্ঞাতি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করলে কেউ তার ঘরে আসতে চাইলো না। খুলনা বহুদিন বনে কাটিয়েছে তাই তাকে সংসারে থাকতে গেলে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হবে—

''রাজা বলে ধনপতি পরীক্ষা করিবে সতী
ব্রাহ্মণের বাড়ী কর স্থান্।''[৯৩]

তপ্ত জ্বলন্ত লোহার ভিড়ায় খুল্লনা সফল হলেন। জতুগৃহের পরীক্ষাতেও সফল হলেন। সমস্ত সতীত্বের পরীক্ষায় খুল্লনা সফল হলে সবাই বুঝতে পারে খুল্লনা সতী নারী। রাজা ধনপতিকে বসিয়ে সম্মান জানান এবং সিংহলে বাণিজ্য করতে যাওয়ার নির্দেশ দেন। খুলনা পাঁচ মাসের গর্ভবতী। ধনপতি পুত্রের নাম স্থির করলেন শ্রীমন্ত। তারপর ডিঙ্গা সাজিয়ে বাণিজ্য যাত্রায় রওনা হলেন। অনেক পথ পেরিয়ে এসে ধনপতির ডিঙা প্রবেশ করল কালীদহে। ধনপতি সেখানে এক আশ্চর্য দৃশ্য দর্শন করলেন। এক দেবীরূপা রমণী প্রস্ফুটিত কমলদলে উপবিষ্ট হয়ে বাম হস্তে হস্তীকে ধারণ করে মুখ গহ্বরে গ্রাস করছেন এবং পর মুহূর্তে তাকে উদ্‌গীরণ করে দিচ্ছে। দৃশ্যটি দেখে ধনপতি অবাক হলেন। রত্নমালার ঘাটে নৌকা এসে উপস্থিত হলো। রাজার কাছে সংবাদ পৌঁছলে তিনি বাণিজ্যের অনুমতি দিলেন। ধনপতি রাজসভায় কালীদহের অদ্ভুত কমলে-কামিনী মূর্তির কথা বললেন। রাজা শর্ত করলেন সে দৃশ্য দেখাতে ধনপতি যদি অসফল হয় তবে রাজার শাস্তি মাথা তাকে নিতে হবে। ধনপতি সে দৃশ্য দেখাতে অসফল হলেন। রাজা তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। স্বপ্নে পদ্মাবতী এসে ধনপতিকে দেবী চণ্ডীর পুজো করতে বলেন। কিন্তু ধনপতি শৈব তাই তিনি পূজা করতে রাজি হলেন না। সাধু কারাগারেই বন্দী হয়ে রইলেন।

অন্যদিকে খুল্লনার একটি পুত্র সন্তান হল। পিতার পূর্ব নির্দেশ অনুসারে পুত্রের নাম রাখা হল শ্রীপতি বা শ্রীমন্ত। বিদ্যাশিক্ষায় অল্প বয়সেই পারঙ্গম হয়ে উঠল শ্রীমন্ত। একদিন শ্রীপতির ঘরে এক ভিক্ষুক ভিক্ষা করতে এলো। তার কদাকার রূপ দেখে শ্রীমন্ত তাকে যথাযোগ্য সম্ভাষন না করায় ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে পিতার প্রসঙ্গ তুলে খোটা দেয়—

''শ্রীপতির ঘর এক দ্বিজবর
আইল ভিক্ষা করিতে।
দেখ্যা কদাকার সাধুর কুমার
গৌণ কৈল প্রণমিতে।।

কোপেতে ব্রাহ্মণ কৈল কুবচন
পিতা মরিল বিদেশে।
হৈয়া ধনমত্ত না জানিস তত্ত্ব
ব্রাহ্মণে অভক্তি শেষে।''[৯৪]

পিতার জন্য পুত্র শোকে ব্যাকুল— 'ডুকর‍্যা কান্দেন শিশু।'[৯৫] সে পিতার সন্ধানে সিংহল পাটনে যেতে চায় এবং পিতা যে জীবিত তাও প্রমাণ করতে চায়—

''মায় কন কি করিব কোথা তোমা পাঠাইব
সিংহল যে সাগরের পার।
ডিঙ্গা নাহি এক খানি আমি ত অবলা প্রাণী
ডিঙ্গা বিনা পথ নাই আর।''[৯৬]

অবশেষে চণ্ডীর কৃপায় শ্রীমন্ত সিংহলের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। শ্রীমন্ত বাণিজ্যে বেরোলে পণ্ডিত বেচারাম ভট্টাচার্যের কাছে গঙ্গার মহিমা শোনে, দাতা রাম ঠাকুরের মুখে জগন্নাথ দেবের তত্ত্বকথা শোনে।

ক্রমে শ্রীমন্তের নৌকা কালীদহের কাছে গেলে ধনপতির মতো তারও একই অভিজ্ঞতা হয়। তারপর এলো সিংহলের রত্নমালার ঘাট। সে দেশের রাজসভাতে শ্রীমন্ত এলো সেদেশে আত্মপরিচয় দিল। পুরোহিত জানতে চাইলেন পথের অভিজ্ঞতার কথা। শ্রীমন্ত কমলে-কামিনী দর্শনের কথা জানালো। রাজা বললেন—

''রাজা বলে বৃদ্ধ বল্যা বাপা মিথ্যা কর‍্যা কল
নাহি জানি কোন বিবরণ।''[৯৭]

রাজা আরো বলেন একথা সত্য হলে কন্যা সুশীলার সঙ্গে তার বিবাহ দিবে। রাজা কালীদহে গেলেন কিছুই দেখতে পেলেন না। শ্রীমন্তকে পিতার কারাগারেই নিক্ষেপ করা হল। পিতা-পুত্রের মিলনের দৃশ্যটি অতি মনোরম করে কবি নির্মাণ করেছেন। শ্রীমন্তের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হলো। কারাগারে শ্রীমন্তের দুঃখ দেখে চণ্ডী বিচলিত হয়ে ওঠেন। এই দুঃখ থেকে উদ্ধারের জন্য দেবী সখী পদ্মাকে বলেন—

''চণ্ডী কন পদ্মা তুই সৃষ্টি মজাইলি।
অকারণ শ্রীপতিকে এত দুখ দিলি।।''[৯৮]

পদ্মার সৈনের সঙ্গে সিংহলরাজের যুদ্ধ হয়। সিংহলরাজ দেবীর কৃপা বুঝতে পারায় পিতা-পুত্র উভয়কে মুক্ত করলেন এবং নিজ কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিলেন।

ধনপতি ও শ্রীমন্তের প্রত্যাবর্তনের সংবাদে উজানিতে বণিক গৃহে আনন্দের আবহাওয়া। পুত্র ও পুত্রবধূকে বরণ করে নিলেন লহনা-খুল্লনা। দেশে ফিরে শ্রীপতি রাজার কাছে ভেট নিয়ে গেলে রাজা কমলে-কামিনীর দৃশ্য নিয়ে তর্ক শুরু করলেন যদি কমলে-কামিনী মূর্তি শ্রীমন্ত দেখাতে পারে তাহলে তার কন্যা জয়াবতীকে শ্রীমন্তের হস্তেই অর্পণ করবেন। শ্রীমন্ত দেবী চণ্ডীর স্মরণ নিল। দেবী কমলে-কামিনীর মূর্তি ধারণ করলেন। রাজা তাঁর প্রতিজ্ঞামত কন্যা জয়াবতীকে শ্রীমন্তের হাতে সমর্পণ করলেন। সুশীলা এ বিয়েকে প্রসন্ন মনে মেনে নিতে পারল না—

''আমি কেশরীর কন্যা সে মোর সতীন।
অভিমানে অভিমানে হইলাম ক্ষীণ।।''[৯৯]

উভয় পুত্রবধূর মধ্যে বিতর্ক উপস্থিত হলে খুল্লনা দু'জনকেই বোঝায়—

''দুজনাই আমার বাপের ঠাকুরাণী।
দুই অতি মহাকুল আমি এই জানি।।''[১০০]

সকলে মিলে দেবী চণ্ডীর পূজা করে। কিছুকাল পরে খুল্লনা গঙ্গায় গিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। মাতার শোকে শ্রীমন্তও প্রাণত্যাগ করে। এভাবে দেবীর পূজার প্রচার সমাপ্ত হলে একে একে সবাই স্বর্গে গমন করলেন।

**তথ্যসূত্র :**


১. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১০২।

২. তদেব, : পৃ. ১৫০।

৩. তদেব, : পৃ. ১০৩।

৪. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, ভূমিকা।

৫. তদেব, : পৃ. ১।

৬. তদেব, : পৃ. ১।

৭. তদেব, : পৃ. ২।

৮. তদেব, : পৃ. ২।

৯. তদেব, : পৃ. ২।

১০. তদেব, : পৃ. ৩।

১১. তদেব, : পৃ. ৩।

১২. তদেব, : পৃ. ৪।

১৩. তদেব, : পৃ. ১১।

১৪. তদেব, : পৃ. ২৫।

১৫. তদেব, : পৃ. ৩৭।

১৬. তদেব, : পৃ. ৩৭।

১৭. তদেব, : পৃ. ৩৮।

১৮. তদেব, : পৃ. ৩৯।

১৯. তদেব, : পৃ. ৬৮।

২০. তদেব, : পৃ. ৫৪।

২১. তদেব, : পৃ. ৫৫।

২২. তদেব, : পৃ. ৫৮।

২৩. তদেব, : পৃ. ৬০।

২৪. তদেব, : পৃ. ৬১।

২৫. তদেব, : পৃ. ৬২।

২৬. তদেব, : পৃ. ৬২।

২৭. তদেব, : পৃ. ৬৪।

২৮. তদেব, : পৃ. ১৫৩।

২৯. তদেব, : পৃ. ১১০

৩০. তদেব, : পৃ. ১১৭।

৩১. তদেব, : পৃ. ১১৯।

৩২. তদেব, : পৃ. ১২০।

৩৩. তদেব, : পৃ. ১৩২।

৩৪. তদেব, : পৃ. ১৪৬।

৩৫. তদেব, : পৃ. ১৫০।

৩৬. তদেব, : পৃ. ১৫২।

৩৭. তদেব, : পৃ. ২১১।

৩৮. তদেব, : পৃ. ২১১।

৩৯. তদেব, : পৃ. ২১৪।

৪০. তদেব, : পৃ. ২২৪।

৪১. তদেব, : পৃ. ২২৭।

৪২. তদেব, : পৃ. ২৫৫-২৫৬।

৪৩. তদেব, : পৃ. ৩০১।

৪৪. তদেব, : পৃ. ৩০৪।

৪৫. তদেব, : পৃ. ৩০৪।

৪৬. তদেব, : পৃ. ৩০৫।

৪৭. তদেব, : পৃ. ৩০৫।

৪৮. তদেব, : পৃ. ৩১০।

৪৯. তদেব, : পৃ. ৩১০।

৫০. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১০২।

৫১. তদেব, : পৃ. ৮৮।

৫২. তদেব, : পৃ. ৯২।

৫৩. তদেব, : পৃ. ৯২।

৫৪. তদেব, : পৃ. ৯৩।

৫৫. তদেব, : পৃ. ৯৪।

৫৬. তদেব, : পৃ. ৯৫।

৫৭. তদেব, : পৃ. ৯৮।

৫৮. তদেব, : পৃ. ৯৯।

৫৯. তদেব, : পৃ. ১০২।

৬০. তদেব, : পৃ. ১০৯।

৬১. তদেব, : পৃ. ১১৩।

৬২. তদেব, : পৃ. ১১৪।

৬৩. তদেব, : পৃ. ১১৭।

৬৪. তদেব, : পৃ. ১১৯।

৬৫. তদেব, : পৃ. ১২১।

৬৬. তদেব, : পৃ. ১৩৬।

৬৭. তদেব, : পৃ.১৪৯।

৬৮. তদেব, : পৃ. ১৫০-১৫১।

৬৯. তদেব, : পৃ. ১৫৪।

৭০. তদেব, : পৃ. ১৫৪।

৭১. তদেব, : পৃ. ১৫৬।

৭২. তদেব, : পৃ. ১৫৮।

৭৩. তদেব, : পৃ. ১৫৯-১৬০।

৭৪. তদেব, : পৃ. ১৬০।

৭৫. তদেব, : পৃ. ১৬৬।

৭৬. তদেব, : পৃ. ১৬৭।

৭৭. তদেব, : পৃ. ১৬৯।

৭৮. তদেব, : পৃ. ১৬৯।

৭৯. তদেব, : পৃ. ১৭১।

৮০. তদেব, : পৃ. ১৭৪।

৮১. তদেব, : পৃ. ১৭৭।

৮২. তদেব, : পৃ. ১৮৬।

৮৩. তদেব, : পৃ. ১৯৫।

৮৪. তদেব, : পৃ. ২০০।

৮৫. তদেব, : পৃ. ২০৯।

৮৬. তদেব, : পৃ. ২১২।

৮৭. তদেব, : পৃ. ২১৪।

৮৮. তদেব, : পৃ. ২১৪।

৮৯. তদেব, : পৃ. ২১৯।

৯০. তদেব, : পৃ. ২২০।

৯১. তদেব, : পৃ. ২২৮।

৯২. তদেব, : পৃ. ২৩৭।

৯৩. তদেব, : পৃ. ২৪১।

৯৪. তদেব, : পৃ. ২৭৮।

৯৫. তদেব, : পৃ. ২৭৯।

৯৬. তদেব, : পৃ. ২৮১।

৯৭. তদেব, : পৃ. ৩২৫।

৯৮. তদেব, : পৃ. ৩৩৫।

৯৯. তদেব, : পৃ. ৩৮৮।

১০০. তদেব, : পৃ. ৩৮৯।